নির্বাচিত ছোটগল্প

নির্বাচিত ছোটগল্প

কে ভি ডমিনিক

অনুবাদ

সবিতা চক্রবর্ত্তী এবং বিশ্বনাথ কুণ্ডু

আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য

নির্বাচিত ছোটগল্প
কে ভি ডমিনিক

অনুবাদ
ড. সবিতা চক্রবর্তী এবং বিশ্বনাথ কুণ্ডু
গ্রন্থস্বত্ত্ব : সবিতা চক্রবর্তী এবং কে ভি ডমিনিক

ISBN: 978-93-91572-14-3

প্রকাশক:
সবিতা চক্রবর্তী
রোহিণী নন্দন প্রকাশনার পক্ষে
১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২

গ্রাম ও পোস্ট অফিস : নিশ্চিন্দা ঘোষ পাড়া, বালী, জেলা : হাওড়া
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন—৭১১২২৭
Phone: 9432240759 e-mail : sabitachakrabarti@gmail.com
প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ২০২২

মুদ্রক: রোহিনী নন্দন মুদ্রণ বিভাগ

মূল্য: ২০০ টাকা মাত্র

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। কপিরাইট ধারকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এই বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, রেকর্ডিং বা কোনো তথ্য সঞ্চয়স্থান এবং পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা সহ কোনো আকারে পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

যাদের আত্মায় বাংলাভাষা

INTRODUCTION

The English people outdid the nawab of Bengal in the battle of Plassey in the year 1757 and within a short passage of time the English people conquered the whole of India. The language of the British lion became the language of those whom the lion ruled. With some people English tongue became their mother tongue. Many of us learnt English language within a short span of time. We started composing literature in English. And now English language is one of the major Indian languages that could be the vehicle of our literature. And surely literature in English is very significant part of Indian literature as such. Rabindranath Tagore who is a Bengali poet and who hailed from Bengal was awarded the Nobel Prize for his writings in English language. Right now English is one of the major Indian languages. Professor K. V. Dominic from Kerala, India is one of the major poets in Indian English. K. V. Dominic is acknowledged writer in Indian English language. He is a major poet, essayist, critic, and short story writer in Indian English. He edits more than one journal in Indian English. He is a path finder for numerous authors & thinkers who are wont to express themselves in English. He himself is a great writer of modern Indian English. This group translates fourteen short stories originally written in English into Bengali language. The translation has been successfully accomplished by Dr. Sabita Chakraborty & poet Biswanath Kundu together. Dr. Sabita Chakraborty is at present a senior teacher of Philosophy at Joypur Panchanan Roy College. She excels in the presentation of the songs composed by Rabindranath. Poet Biswanath Kundu is also a name in the realm of modern Indian English poetry. He has of late published Poetry Dot 6, a book of poems composed in English. It has drawn the attention of numerous readers. The French photographer and painter Dominique de Miscault has illustrated the book of poems. The joint venture of

Biswanath and Sabita in bringing out the translation into Bengali language has attained a niche in the realm of translation literature. Every sentence of Dominic has been mutually read by both Sabita and Biswanath till it has been transformed into Bengali. Translation is a unique activity where two languages participate. They are the source language and target language. The aim of translation is to transform the idiom of source language into the idiom of target language. The short stories of K. V. Dominic have been posed with the different materials and motifs of Indian thought system. Dominic has deftly used the notion of transmigration of soul. Because of these motifs Dominic's short stories stand out in world literature. Anyone who peruses Dominic no matter to which country or language he or she belongs to will get a first hand experience of authentic Indian culture. Dominic belongs to Kerala that is why the landscape of Kerala and Malayalam culture, custom and faith are littered in the short stories. Dominic's short stories have gushed forth from deep love and compassion. He is not a modernist in the so-called sense of the term. He has employed the theory of karma and transmigration of soul to raise his short stories. They are didactic withal with great skill. Biswanath and Sabita have transformed English language, the background and the culture as well as the nature of Kerala into the linguistic echo-system of Bengali language. Bengali readers will read these stories as if they are composed in their mother tongue or Bengali. Of course, since the short stories have been largely forged against the background of Keralitic milieu there has been a strangeness added to the seas and lagoons of Kerala. The defamiliarization of nature & culture is bound to draw the Bengali readers to the short stories. Thanks are due to Dominic who has recreated Kerala, nature and culture with great power and force. We, Bengali readers are grateful to the translators for blowing the mind dank with sea waters and conch voice of the seas through the plains and hills of Bengal. Thank you Sabita and thank you Biswanath.

Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

মুখবন্ধ

১৭৫৭ সালে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে জয়লাভ করল। আর তার কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজরা গোটা ভারতবর্ষ দখল করল। রাজার ভাষা বহুলাংশে প্রজার ভাষা হয়ে উঠল। কিছু লোকের ইংরেজী ভাষাটা মাতৃভাষা। আমরা অনেকেই ইংরেজী ভাষা শিখে ফেললাম। সেই ভাষাতেই আমাদের সাহিত্য রচনা শুরু হল। এবং আজ ভারতীয় ভাষা গুলোর সংগে ইংরেজী ভাষাও সাহিত্য রচনার একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে এবং অবশ্যই ইংরেজী ভাষায় রচিত সাহিত্য ভারতীয় ভাষার অনিবার্য অংশ হয়ে উঠেছে। বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে নোবেল প্রাইজ পেলেন এবং ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্য অবারণ উৎসারিত হল। এখন ভারতীয় ভাষা গুলোর মধ্যে ইংরেজী ভাষা অন্যতম। ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষায় যারা সাহিত্য রচনায় ব্রতী তাদের মধ্যে কেরালার অধ্যাপক কে ভি ডমিনিক অনন্য একজন। কে ভি ডমিনিক ইংরেজী ভাষায় কাব্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা এবং ছোট গল্প রচনায় একজন প্রধান পুরুষ। তিনি ভারতীয় ইংরেজী ভাষায় একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বহু প্রতিভাবান লেখক এবং চিন্তাবিদকে তিনি পথ দেখিয়েছেন। ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যে আধুনিককালে তিনি নিজেই একটি অনন্য নাম। এই গ্রন্থে তার রচিত ইংরেজী ভাষার ১৪টি ছোট গল্প বাংলায় অনুদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ডঃ সবিতা চক্রবর্ত্তী এবং কবি বিশ্বনাথ কুন্ডু। ডঃ সবিতা চক্রবর্ত্তী হাওড়ার জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজের দর্শনের অধ্যাপিকা। আধুনিক বাংলায় সংগীত উপস্থাপনায় তিনি বিশিষ্টতার দাবী রাখেন। এ ছাড়া বাংলা ছোট গল্প ও প্রবন্ধ তার উপস্থাপনায় একক বৈশিষ্টে চমৎকার। কবি বিশ্বনাথ কুন্ডু ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত Poetry Dot 6 কাব্যগ্রন্থটি বহু পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। ফরাসী চিত্রকর ডমিনিক ডেমিস্কল্ট তার কবিতা গুলোর চিত্ররূপ দিয়েছেন। বিশ্বনাথ এবং সবিতা যৌথভাবে কে ভি ডমিনিকের গল্প গুলোকে অনুবাদ করেছেন। অর্থাৎ ডমিনিকের প্রতিটি বাক্য এদের উভয়ের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় রূপ পেয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য একটি অভিনব ব্যাপার। সেখানে দুটি ভাষা জড়িয়ে আছে। প্রথমটি হল উৎস ভাষা বা Source Language যেটিকে অনুবাদ করা হয় এবং দ্বিতীয়টি হল Target Language অর্থাৎ যে ভাষায় উৎস ভাষাকে রূপান্তরিত করা হল। ভাষার বিষয়বস্তু থেকে লক্ষ্য ভাষায় বা Target Language এ অনুবাদের অর্থ হল উৎস ভাষাকে লক্ষ্য ভাষার বাগধারায় রূপান্তরিত করা এবং বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থে ভারতীয় ইংরেজী ভাষার চলনকে লক্ষ্য ভাষা বাংলার বাগধারায় উপস্থাপন করা। কে ভি ডমিনিকের ছোট গল্প গুলো ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে রচিত। জন্মান্তর ভারতীয় ভাবনার এক অন্যতম কৌশল। ডমিনিক তা অত্যন্ত সাফল্যের সংগে ব্যবহার করেছেন। সেই জন্য বিশ্বের ছোট গল্পে ডমিনিকের একটি নিরাপদ স্থান আছে। ডমিনিকের গল্প গুলো ভারতীয় সংস্কৃতিতে অবগাহন করে স্নিগ্ধ এবং পবিত্র, ডমিনিকের গল্প গুলো পড়লে পৃথিবীর যে কোন দেশের পাঠক প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবেন। তিনি কেরালার মানুষ তাই কেরালার ল্যান্ডস্কেপ এবং মালয়ালাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি, প্রথা ও বিশ্বাস তার ছোট গল্পে প্রকীর্ণ। তার ছোট গল্প গুলো সহানুভূতি ও ভালবাসার উৎস ভূমি থেকে উৎসারিত। তিনি তথা কথিত ভাবে আধুনিক নন। ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁর প্রতিটি রচনার উৎসে। কাহিনী নির্মাণে তিনি কর্ম ফল এবং জন্মান্তরকে ব্যবহার করেছেন এবং অবশ্যই তাঁর কাহিনী গুলো didactic, ইংরেজী ভাষার সংগে কেরালার লৌকিক এবং প্রাকৃতিক পটভূমিকে বাংলা ভাষায় ভাষার নৈপুণ্যে বিশ্বনাথ ও সবিতা, সবিতা ও বিশ্বনাথ আশ্চর্য দক্ষতার সংগে বাংলা ভাষায় জীবৎকল্প করে এই অনুবাদ উপস্থাপন করেছে। কেরালার পটভূমি এই বাংলা অনুবাদ পাঠে বাঙালীর কাছে একান্ত আপন বলেই মনে হয়। কেরালার প্রকৃতির প্রাচুর্য এবং মালয়ালাম সংস্কৃতির ? ঐশ্বর্য্য বাঙালীর কাছে একটা নান্দনিক দূরত্ব তৈরী করে নিশ্চয়ই কিন্তু সেই দূরত্ব গ্রহান্তরের দূরত্ব নয়। বাঙালী জানে যে সংস্কৃতি কাহিনী গুলোকে রচনা করেছে সেটার সংগে বাঙালী সংস্কৃতির হয়ত কোথাও কোথাও অমিল আছে। এই অমিলই বাঙালী পাঠককে কাহিনী গুলোর সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করে এবং পাঠক বুঝতে পারেন এই সংস্কৃতি বাঙালী পাঠকের একান্ত আপন প্রতিবেশী সংস্কৃতি। ছোট গল্প গুলো রচনার জন্য যেমন কে ভি ডমিনিককে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার তেমনি কেরালার প্রকৃতি, কেরালার পরিবেশ ইত্যাদি পুনঃ নির্মাণের জন্য সমুদ্রের ভাষা এবং বাতাস বাংলা রচনা গুলোতে প্রবাহিত করার জন্য সবিতা এবং বিশ্বনাথকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূ চি প ত্র

দায়ী কে?	১৩
তারা কি আমাদের বোন নয়?	২০
একজন মহৎ পরার্থপর ব্যক্তি	২৮
আদর্শ সরকারী কর্মচারী	৩৩
সেনথিল কুমারের কাছ থেকে একটি ইমেল	৪০
সঞ্চিত কর্ম	৪৪
যমজেরা	৪৯
বিশ্ব পরিবেশ দিবস	৫৭
পশুদের চেয়ে মানুষের জীবন কি মূল্যবান?	৬২
বহুসংস্কৃতি সমন্বয়	৬৮
ক্লেমেন্টের ইউ এ ই (UAE) থেকে প্রত্যাবর্তন	৭৬
পরিযায়ী শ্রমিকদের অদৃষ্ট	৮১
প্রকৃতি শেখায়	৮৬
সীতার সংকল্প	৯১

দায়ী কে?
Who is Responsible?

ভারতের কেরালায় কুমারকমে রহমান এবং তার স্ত্রী এক প্রাসাদোপম দোতলা বাড়ীতে বাস করতেন। রহমানের বয়স তিয়াত্তর এবং তার স্ত্রীর বয়স আটষট্টি। বাড়ির সামনের দিকে ভেম্বনাদ লেক। তিনি এক আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে দেখছেন ভেলা, বজরা, ডিঙ্গি নৌকা, প্রমোদ তরী, বাড়ির নৌকা গুলো কেমন মালপত্র, যাত্রী এবং পর্যটকদের এদিক ওদিক নিয়ে চলেছে। রঙিন স্বপ্ন এবং প্রত্যাশা নিয়ে সবাই যাত্রা করছেন, মনে মনে তিনিও তাদের যাত্রার শরিক হয়ে পড়লেন।

‘‘আমার যৌবনে আমিও ওদের মত প্রাণচঞ্চল এবং উৎসাহে ভরপুর ছিলাম। সে সব সুখের দিন চলে গেছে। আমাকে প্রকৃতির নিয়মের অধীন হতে হয়েছে। সুখ দুঃখ জীবনেরই অঙ্গ। পর্বতের একটা উপত্যকা থাকে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের পরে অন্ধকার রাত্রি নামে। কিন্তু আমি কি আমার প্রত্যাশা গুলো সেই ভাবে লালন পালন করি যে শীতের পরে বসন্ত আসবে? হয়ত হতে পারে অন্য কোনো জগতে বা পরবর্তী জীবনে,’’ রহমানের মনটা দার্শনিক ভাবনাকে আশ্রয় করে অতীতে ডুবে গেল।

রহমান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করে অবসর নিয়েছিলেন। স্কুলে চাকরী করতেন। স্কুলটা ছিল তার বাড়ী থেকে দু কিলোমিটার দূরে। রমলা উঁচু ক্লাসের গণ্ডী পার করেছিলেন মাত্র। ফলত তাকে গৃহবধূ হয়ে থাকতে হয়েছে। তাদের এক ছেলে এবং দুই মেয়ে। মেয়ে দুটির দুই ব্যবসায়ীর সংগে বিয়ে হয়েছে। একজন তিরুবন্তপুরম এবং অন্য জন থড়ুফুজাতে বসবাস করে। কোনো উৎসব পার্বণে মাত্র তারা বাবা মায়ের সংগে দেখা করতে আসে। এমনকি ফোনও করে না বললেই চলে। রহমান এবং রমলার ছেলে আনোয়ার ওমানে একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করে। যেহেতু পড়াশোনায় বিশেষ

মনোযোগী ছিল না আনোয়ারকে পলিটেকনিক সার্টিফিকেট নিয়েই পড়াশোনায় ইতি টানতে হয়েছিল। একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ার কারণে বাবা মা চেয়েছিলেন সবসময় তার সংগে থাকতে। যেহেতু কেরালা এমন এক রাজ্য যেখানে বেশীরভাগ মানুষ শিক্ষিত এবং কাজের সুযোগ পায় খুব কম জন সেজন্য আনোয়ার নিজে বা তার বাবা মা কেউই তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে নি। কাজের জন্য আনোয়ার দেশের বাইরে যেতে বাধ্য হয়। সে আরবের ওমানে একটা কোম্পানিতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হিসেবে কাজ পায়। যদিও কাজটা ছিল ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু বেতন ছিল বড়ই লোভনীয়।

রহমানের ৪৩০০ স্কোয়ার ফুট ছাড়া আর স্থাবর সম্পত্তি ছিল না। তার অল্প আয় থেকে বেশ কিছু বছর আগে তিনি এই সম্পত্তি কিনেছিলেন। সেখানে ছোট একটা বাড়িতে টালি বসানো ছাঁদটি পর্যন্ত করতে পেরে ছিলেন।

স্কুল শিক্ষক হিসেবে তার খুব সুনাম ছিল। পেশার প্রতি তিনি ১০০ ভাগ সৎ ছিলেন। পেশাগত জীবনে তিনি কখনো ছাত্রদের বেত মারেন নি বা বকাবকি বা নির্যাতন করেন নি। তার সহকর্মীরা যখন বেত ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি সব সময় শারীরিক নিগ্রহের বিপক্ষে ছিলেন। রহমান তার আন্তরিক ভালবাসা এবং সহমর্মিতা দিয়ে ছাত্রদের এবং তাদের বাবা মায়ের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। গ্রামের লোকের, স্কুল থেকে পাশ করা পুরোণো ছাত্রদের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছিল তার জীবনে একমাত্র মূলধন। এর ফলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে সুখে বৃদ্ধ বয়সে তার অবসর জীবন যাপন করছিলেন। একদিন তিনি সন্ধ্যে বেলা পঞ্চায়েতের সমবেত জনতার সভা ঘরে (গ্রাম সভা) গিয়েছিলেন এবং সরকারের স্বাক্ষরতা সূচীতে যুক্ত হয়ে যান, বয়স্ক অশিক্ষিত মানুষদের শেখাতে শুরু করেন যারা একসময় ছেলে বেলায় পরিস্থিতির চাপে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

রমলা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তার দেহের সংযোগকারী অঙ্গ গুলোতে খুবই যন্ত্রণা হচ্ছিল। কয়েকটি হাসপাতালে তাকে দেখানো হয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিলেন যে তিনি গুরুতর প্রকারের আরথাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন। অনেক রাত্রিতে তিনি জেগে কাটাতেন, ঘুমোতে পারতেন না। অথচ গৃহস্থালির সব কাজ তাকে করতে হত যেহেতু পরিচারিকা বা কাজের লোক পাওয়া যায় নি। রহমান এবং রমলা ঠিক করলেন যে তারা ছেলের বিয়ে দেবেন। আনোয়ার ইতিমধ্যে চব্বিশ বছরের হয়ে গেছে এবং মুসলিম ছেলেদের সাধারণত কুড়ির কোঠার প্রথম দিকেই বিয়ে হয়। যদিও আনোয়ার প্রথমে বিয়েতে রাজী হচ্ছিল না শেষ পর্যন্ত বাবা মায়ের চাপে রাজী হয়। সে যা রোজগার করেছিল তাই দিয়ে দোতলা বাড়ি সে ইতিমধ্যে

বানিয়ে ফেলেছে। অনেক ধনী পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল। বিয়ের ব্যাপারে বিদেশে চাকরী করে এমন পাত্রের খুব চাহিদা। পাত্রীর ছবি সমেত যে সব প্রস্তাব এসেছিল তাদের মধ্যে থেকে আনোয়ারের কাছে অনেক মেয়ের ছবি পাঠানো হল এবং সেই সব ছবির মধ্যে সুন্দরী একটি মেয়েকে সে নির্বাচন করল। বিয়ের দিন ঠিক হল।

দু মাস অপেক্ষার পর আনোয়ার বিয়ের জন্য মাত্র পঁচিশ দিনের ছুটি পেল। বিয়ের অনুষ্ঠান এবং ভোজ পর্ব আড়ম্বরে সম্পন্ন হল। বধূটি অপূর্ব সুন্দরী - সর্বাংশে আনোয়ারের সঙ্গে মানানসই। তাদের মধুচন্দ্রিমার জন্য দশটি দিন আর হাতে আছে। আনোয়ার এবং আয়শা তামিলনাড়ুর মনোরম পার্বত্য স্থানের এক হোটেলে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গিয়েছিল। তারা সেখানে মাত্র দুটো দিন ছিল। আয়শার আনোয়ারের সংগে দাম্পত্য সুখ স্বর্গীয় মনে হয়েছিল তার প্রস্থানের সময় পর্যন্ত। স্বভাবত, আনোয়ার এবং আয়শা দুজনের কাছে বিচ্ছেদটা ছিল হৃদয় বিদারক। অঝোরে অশ্রু ধারা বধূর গাল বেয়ে নেমে এল। আনোয়ারের চোখও জলে পূর্ণ হল। ঘটনা হল এই যে সে আবার দু বছর পর ছুটি নিতে পারবে - এই ভাবনাটাই তাদের কষ্ট শত গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। রহমান এবং রমলাও ছেলের চলে যাওয়ার কারণে দুঃখিত হয়েছিলেন।

আয়শা তার চলে যাওয়ার পর প্রতি রাত্রে ফোন করত, ঘণ্টা দুয়েক তারা বাক্যালাপ করত। আনোয়ার তার বাড়িতে গাড়ি চালানোর জন্য এক ড্রাইভার নিয়োগ করেছিল। কারণ আয়শা গাড়ি চালাতে জানত না। গাড়ির চালক রাহুল ছিল সুদর্শন যুবক। ধীরে ধীরে আয়শার দুঃখ এবং একাকীত্ব চলে গেল। সে প্রায় প্রতিদিনই গাড়ি করে বাইরে যেত কোন দিন কেনাকাটা, কোন দিন সিনেমা, কোন দিন নিজের বাপের বাড়ি এবং বন্ধুদের বাড়ি। রমলা বা রহমান আয়শাকে কিছু বলতে পারছিলেন না সে কি করবে বা করবে না। সর্বোপরি আয়শা চেয়েছিল শুধুমাত্র তার স্বামীর অনুগত থাকতে - এটাই ছিল তার নীতি। আনোয়ার তার মায়ের কাজে সাহায্য করার জন্য বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ রাহুল সারাক্ষণ তাকে সঙ্গ দিত এবং চটুল হাসি ঠাট্টায় তারা মজে থাকত। ড্রাইভার সন্ধ্যে নামলে বাড়ি যেত এবং সকাল বেলা চলে আসত।

আয়শা কি বধূর লক্ষণ রেখা অতিক্রম করছিল, না রাহুল রাবণের মত তাকে প্রলুব্ধ করছিল? রমলা প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং রহমান সন্দেহের সারবত্তা খেয়াল করলেন। তারা আয়শা বা রাহুলকে কিভাবে সাবধান করবেন? মনে হল, তাদের সম্পর্ক কি নিছক ভাল বন্ধুত্বের? গৃহের গণ্ডির সন্দেহ প্রতিবেশীদের মধ্যে

ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিবেশীরা মুখরোচক কাহিনী তৈরী করতে শুরু করে। এক সময় রমলা যখন আয়শাকে তাদের নিয়ে পরচর্চার ইঙ্গিত দিয়ে ছিলেন সে ভয়ংকর ক্রোধ প্রকাশ করে ছিল। সে মন্তব্য করেছিল যে লোকজন তার প্রতি ঈর্ষান্বিত তাছাড়া তারা কোন মহিলাকে এমন অপবাদ দিতে পারে না যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছে। বাস্তবিক, সে প্রতিদিন তার স্বামীকে ফোন করত এবং অনেকটা সময় কথা বলত।

রহমানের আয়শার প্রতি সন্দেহ প্রকাশের কোন সাহস নেই। একই ভাবে আনোয়ারের প্রতি প্রশ্ন তোলাও অন্যায় যা তাকে সন্দেহ এবং হতাশার অভিশাপে নিক্ষেপ করবে। তদুপরি, আনোয়ার তাদের দোষারোপ করতে পারে কেন তাকে আমরা বিয়েতে বাধ্য করে ছিলাম। সেটাই তো এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আয়শা ক্রমশ রহমান এবং রমলার সংগে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। সে যুবতী, স্বাস্থ্যবতী এবং ভোগের প্রতি আসক্ত। এ কথা সত্য যে সে গৃহবধূ কিন্তু তার দেহ ত কোন নৈতিকতার বাঁধ মানে না। তার জৈবিক চাহিদা কে মেটাবে? কতক্ষণ সে তার কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? কিভাবে সে জৈবিক আকর্ষণকে রুদ্ধ করে রাখবে? তার স্বামীর পক্ষে এত সময় ধরে তাকে একলা ফেলে রাখাটা কি ন্যায়? আনোয়ারকে কি দোষ দেওয়া যায়? সে তো নিজেই বিয়ের বিপক্ষে ছিল। তাহলে কাকে দোষী হিসেবে অভিযুক্ত করা করা যেত?

এই রকম বিষণ্ণতা এবং হতাশার আবহ রহমানের পরিবারকে তাড়িয়ে চলেছিল। রমলার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল এবং হাটতে গেলে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। তবু সে সকালে রান্না বান্না করত যেহেতু আয়শা সব সময় দেরীতে ঘুম থেকে উঠত। একদিন, সকালে যথারীতি রমলা রান্না শেষ করে ফেলেছেন এবং তার স্বামী এবং আয়শার প্রাতরাশ খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। যেহেতু আয়শা দোতলা থেকে নীচে নামছে না রমলা দোতলায় তার শোবার ঘরে ঢুকলেন। ঘর খোলা কিন্তু সে ঘরে নেই। রমলা জোরে তাকে ডাকলেন, কিন্তু কোন উত্তর নেই। বোঝা গেল সে বাড়ির বাইরে গেছে। রহমান বৃথাই প্রতিবেশীদের বাড়িতে তাকে খুঁজলেন। তখন রাহুলের বাড়ি গেলেন এবং জানলেন সেও বাড়ি নেই। রহমান বুঝলেন রাহুল আয়শাকে নিয়ে পালিয়েছে।

''হে ঈশ্বর কেন এই রকম ভাবে তুমি আমাকে পরীক্ষা কর? আমরা কি অপরাধ করেছি? আমি কিভাবে এই বিষয়টা আমার ছেলেকে জানাব? এই বদনাম আমরা কি করে সহ্য করব? সব জেনে রমলা কি করবে? পুলিসে অভিযোগ জানিয়ে কি লাভ?'' বাড়ি ফেরার পথে এই রকম উত্তরহীন প্রশ্ন গুলো রহমানের মনকে ক্ষত

বিক্ষত করেছিল।

বাড়িতে ঢোকা মাত্র রমলা তাকে বলেন, ''তাকে দেখতে পেলে? রাহুল কি বাড়িতে?''

রহমান অনুচ্চ স্বরে বলেনঃ ''রাহুলের ও খোঁজ নেই''।

''আল্লা, আমাদের ছেলেকে রক্ষা কোরো ! কোন ছলনাময়ী শয়তান তার পিছু নিয়েছে!'' একথা বলে সে বিছানায় পড়ে গেল। প্রতিবেশীদের সাহায্যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আই সি ইউতে (ICU) ভর্তি করা হল। ডাক্তার বললেন যে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন।

এক প্রতিবেশী রহমানকে বললেনঃ ''আমাদের কি আনোয়ারকে সব জানানো উচিত নয়?''

রহমান বললেনঃ ''আমি কিভাবে ছেলেকে জানাব যে তার বউ একজন ড্রাইভারের সংগে পালিয়েছে? তাকে জানিয়ে কি হবে যে এই কারণেই তার মা হাসপাতালে ভর্তি? সে ছুটি পাবে না এবং আসতেও পারবে না। যখন সে ফোন করবে আমি তাকে বলব।''

কয়েক দিন পর রমলা হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন এবং তাকে বাড়িতে আনা হল। রহমানের ভাই তার পাড়া থেকে একজন কাজের লোক নিয়ে এলেন। তার নাম সাহানা। সে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত থেকে সব কাজ করবে। তারপর বাড়ি ফিরে যাবে।

ঘণ্টা খানেক সময় রহমান তার জীবনের সুসময় এবং পরে দুঃসময়ের স্মৃতি চারণ করে কাটালেন তার স্বর্গ সদৃশ বাড়ি এখন দুঃখ এবং হতাশার আগারে পরিণত হয়েছে। আয়শা চলে যাবার পর থেকে আনোয়ার ফোন করে নি। যদিও রহমান তার সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে কোন উত্তর আসে নি। তার কি হয়েছে কে জানে? আয়শার পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা কেউ কি তাকে জানিয়েছে? রহমানের ভারাক্রান্ত মন পিওনের আগমনে বাঁধা পেল। রহমান একটা রেজিস্ট্রি করা চিঠি পেলেন। চিঠিটা ওমান সালতানাত থেকে এসেছে। কাঁপা হাতে তিনি চিঠিটা খুললেন। চিঠির বিষয় তাকে হতভম্ব করে দিল। চিঠিতে লেখা আছে যে কোম্পানিতে সে চাকরী করত সেখানে তাকে ছাটাই করা হয়েছে যেহেতু সরকার বিরোধী সন্ত্রাস বাদী কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

রহমান আর্তনাদ করে উঠলেন, ''না, আমার ছেলে কক্ষনো সন্ত্রাসবাদী হতে

পারে না। আমি তাকে মহৎ উদারবাদের শিক্ষা দিয়েছি। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। সেই একমাত্র ঈশ্বর যিনি সমগ্র মানব জাতিকে লালন করছেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করছেন। সে কি করে জেহাদী হবে বা কোন গোষ্ঠী ভুক্ত হয়ে গণহত্যায় বিশ্বাস করবে? ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিচ্ছ না? আমি এসব সহ্য করতে পারছি না। আমি মরতে চাই''। উচ্চৈঃ স্বরে কান্না শুনে কাজের মহিলাটি দৌড়ে এল।

''স্যার আপনার কি হয়েছে?''

''আমি আমার ছেলেকে হারিয়ে ফেলেছি, সাহানা। তোমার মা কি এখনও ঘুমোচ্ছে?''

''হ্যাঁ, স্যার। তাকে কি ডেকে দেব?''

''না না। ভুলেও যেন তাকে এই খবরটা জানিও না। আনোয়ারের চাকরী চলে গেছে। সে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য গ্রেফতার হয়েছে। সাহানা, তোমাকে মিনতি করছি এই কথা কিন্তু অন্য কাউকেও বোলো না। সাহানা, তুমি কি আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারো? আমি আর বাঁচতে চাই না।''

''স্যার, এ আপনি কি বলছেন? আপনার ছেলের কিছু হয় নি। সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে। সে কখনোই সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না কারণ সে আপনার ছেলে। আপনি যদি মরে যান তাহলে গিন্নিমাকে কে দেখবে?''

''হে প্রভু, কেন তুমি আমাকে এই ভাবে পরীক্ষা করছ?'' একথা বলে তিনি তার ঘরে চলে গেলেন। সাহানা যথারীতি দৈনন্দিন কাজ শেষে সন্ধ্যে ছ টা নাগাদ বাড়ি চলে গেল। স্যারের কাছে সে যা শুনেছে গিন্নীমাকে কিছুই বলে নি। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল তিনি যেন স্যারকে এই বিপর্যয় সহ্য করার শক্তি দেন।

পরদিন খুব সকালে সাহানা তার মনিবের বাড়ি কাজে এসেছে। সামনের মূল গেটের দরজাটা খোলা। সে দরজায় কলিং বেলটা বাজাল। কেউ এল না দরজা খুলে দিতে। আবার সে বেল বাজাল কিন্তু এবারও কোন সারা শব্দ নেই। সে উচ্চস্বরে মনিবকে ডাক দিল, ''স্যার, দয়া করে দরজাটা খুলুন। আমি সাহানা।''

কোন সাড়া শব্দ নেই। সে ঘুরে বাড়ির পিছনের দরজার দিকে গেল। এই দরজাটা খোলা ছিল। সে রান্না ঘরে ঢুকে মনিবকে ডাকল। তবু কোন উত্তর নেই। সাহানা সরাসরি দ্রুত গিন্নী মার শোবার ঘরে ঢোকে যেখানে স্বামী স্ত্রী রাতে ঘুমোয়। আতঙ্কিত হয়ে সে দেখে গিন্নী মা রক্তে ভেসে আছে। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, ''হায় ঈশ্বর ! গিন্নী মা, একি হয়েছে আপনার?''

সে মনিবের খাটের দিকে তাকায় যেখানে তিনি ঘুমোন। তিনিও রক্তে মাখামাখি। সে আর্তনাদ করে ওঠে, ''কি ভয়াবহ ! কোন্ দুরাত্মা এই রকম করেছে?''

চিৎকার করতে করতে সে দৌড়ে প্রতিবেশীদের ডাকতে বাড়ির বাইরে এল। প্রতিবেশীরা দ্রুত শোবার ঘরে ঢোকে এবং দেখে রহমান এবং রমলা ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বিছানা রক্তে মাখামাখি হয়ে গন্ধ ছড়াচ্ছে। পুলিস এসেছিল এবং তন্ন তন্ন করে ঘরের প্রতিটি কোণ পর্যবেক্ষণ করেছে অপরাধের সুত্র পাওয়ার জন্য। তারা আবিস্কার করেছেন যে যেখানে টাকা পয়সা এবং সোনা দানা থাকে সেই আলমারি খোলা এবং ভিতরের জিনিস পত্র চুরি গেছে। নির্দয় নির্মম এই জোড়া হত্যার খবর চারপাশের গ্রামে এবং সমগ্র রাজ্যে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার জনতা বাড়ীতে আসে।

আগেই বলা হয়েছে রহমানের পরিবার সমগ্র গ্রামে প্রিয় এবং সন্মানিত পরিবার ছিল। পুলিস তাদের নিয়ম মাফিক কাজ শেষ করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ এবং ময়না তদন্ত করতে কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল। পুলিসের প্রশিক্ষিত কুকুর হত্যাকারীকে খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। রহমানের মেয়ে জামাই তাদের ছেলে মেয়ে মৃত দেহের চারপাশে ঘিরে কান্নাকাটি করে। গোটা বাড়িটা জুড়ে যেন নরকের হাহাকার। বিকেলে মৃত দেহ কবরস্থ করা হয়েছিল। শত সহস্র শোকার্ত লোকজন উপস্থিত ছিল সেই অনুষ্ঠানে। এলাকার নির্বাচিত মন্ত্রী জনতাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে অবিলম্বে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা হবে, ধরা হবে। পুলিশ অপরাধীকে ধরতে পারে কিন্তু পরিসংখ্যানের দিক থেকে মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ সম্ভাবনা। রহমান এবং তার পরিবারের এই বিয়োগান্তক দুঃখজনক ঘটনার জন্য কাকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে? যখন হাজার হাজার নেকড়ে দুর্বৃত্ত বেড়ে চলেছে এবং তারাই রাজত্ব করে। রহমানের মত নিরীহ ভেড়া নৃশংস ভাবে জবাই হয়। প্রকৃত ন্যায় কি কোথাও আছে?

তারা কি আমাদের বোন নয়?

Aren't they our Sisters?

রাজেশ মুম্বাই বিমান বন্দরে নেমে সোজা কামাথিপুরা যাওয়ার জন্য ৬০০ টাকা অগ্রিম দিয়ে একটা ট্যাক্সি বুক করে। রাজেশ গাড়িতে উঠে বসলে গাড়ী যাত্রা শুরু করে।

রাজেশ জিজ্ঞাসা করে, ''ড্রাইভার, তোমার নাম কি?''

''আমি অরুণ, স্যার।''

''কামাথিপুরা কতদূর?''

''১৮ কিলোমিটার স্যার।''

''কতক্ষণ সময় লাগবে?''

''সবচেয়ে বেশী হলে কুড়ি মিনিট, স্যার। আপনি কোথা থেকে আসছেন?''

''কেরালা।''

কথোপকথন শেষ হয়ে গেল। রাজেশের অরুণকে খুব নম্র এবং ভদ্র বলে মনে হল। সে রাজেশের ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটাও অবান্তর প্রশ্ন করে নি। অনেক বছর আগে রাজেশ মুম্বাই এসেছিল, শহরটা অনেক পালটে গেছে। এখন অনেক ফ্লাইওভার, স্কাই স্ক্রাপার এবং ভীষণ ব্যস্ত ট্রাফিক! এক জায়গায় এসে গাড়িটা থামে। ড্রাইভার বলে, ''স্যার, আমরা কামাথিপুরা পৌছে গেছি''। ''হ্যাঁ, এইবার খুব তাড়াতাড়ি পৌছে গেছি'' একথা বলে রাজেশ গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। ''ধন্যবাদ অরুণ''। ''স্বাগত, স্যার'' অরুণ উত্তর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। তখনি সুসজ্জিত পোশাক পরিহিত এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি রাজেশের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল।

''স্যার, আমি কিশোর, পতিতালয়ের দালাল। আপনি কেমন মেয়ে চাইছেন?''

''আমি কেরালার সুন্দরী একটি মেয়েকে চাইছি। বয়স এই কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে।''

''ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করব। আপনি যদি ১৫০০ টাকা খরচ করতে রাজী থাকেন সেই মেয়েটি এখানে আসবে এবং তার ঘরে নিয়ে যাবে এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মের শেষে আপনাকে আবার এখানেই নামিয়ে দিয়ে যাবে। বা, আপনি যদি সরাসরি মেয়েটির ঘরে যেতে চান আপনি ৫০০ টাকায় পেয়ে যাবেন।''

''আমি সেই গলিতে যেতে চাইছি যেখানে কেরালার মেয়েদের পাওয়া যাবে এবং তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আমি বেছে নেব।''

''ঠিক আছে স্যার, চলুন একটা ট্যাক্সি নিয়ে নি, আমি আপনাকে সেই গলিতে নামিয়ে দেব যেখানে আপনি পছন্দমত মেয়ে পেয়ে যাবেন।''

''ঠিক আছে, ট্যাক্সি ডাকো তাহলে।''

কিশোর একটা ট্যাক্সি ডাকল। তারা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই গলিতে পৌছে গেল। গোটা শহরটা ভীষণ নোংরা দেখাচ্ছিল, গলি গুলোয় বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিড় - রাস্তায় যৌনকর্মী, তাদের পরিবার, খদ্দের, কুকুর, গরু, রিক্সা, সব্জিওয়ালা, ফলওয়ালা। রাস্তার দু পাশের বাড়ি গুলো মনে হচ্ছিল শতাব্দী প্রাচীন, তাতে সংস্কারের এবং সাজসজ্জার চিহ্ন মাত্র নেই। একবার কোন মানুষ সেখানে গেলে আর কোন দিন সেখানে যেতে চাইবে না একমাত্র যৌন তাগিদ ছাড়া। রাজেশ গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ১০০ টাকা ভাড়া মিটিয়ে দিল এবং কিশোরকে সে ৫০ টাকা দিয়ে গলির দিকে হেঁটে এগিয়ে গেল। তাকে দরজা এবং জানালার সামনে দাঁড়ানো অনেক মেয়েকে দেখানো হল। রাজেশের লিপস্টিক এবং পাউডারে সুসজ্জিত কিছু জনকে কুড়ির কোঠায় মনে হল, কিছু জনকে তিরিশের ঘরে, এমনকি কিছু জনকে চল্লিশের ঘরে মনে হল। প্রথম তলাতে দরজার সামনে দাঁড়ানো একজনের রূপ রাজেশকে মুগ্ধ করল। সে সরাসরি সংকীর্ণ কাঠের সিড়ি বেয়ে তার কাছে চলে গেল। সেই মেয়েটি তাকে ঘরে নিয়ে বসতে একটা চেয়ার দিল। ঘরটা ঘুপচি, ভিতরে ছিল কেবল একটা পুরোনো চেয়ার, টেবিল এবং একটা একজন শোয়ার মত খাট। কম দামী সেন্টের উগ্র গন্ধে রাজেশের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সময় নষ্ট না করে সেই মেয়েটি বলল।

''প্রথমে আমার প্রাপ্য ৫০০ টাকা দিন। ব্যবসার পরে অনেকে প্রতারণা করে।

রাজেশ তাকে একটা ৫০০ টাকার নোট দিল। তারপর সংলগ্ন বাথরুম দেখিয়ে সেই মেয়েটি তাকে বলল :

''স্নান করে নিন তারপর আসুন। আপনাকে কাজের সময় অবশ্যই কনডোম নিতে হবে। আমি চুমু খেতে দেব না এবং পোশাকও খুলব না।''

''কিছু মনে করবেন না আমি যৌন কামনা মেটাতে আসিনি। আমি কোচির গোবিন্দ মিলের মালিক যেখানে জামা কাপড় তৈরী হয় এবং রপ্তানি হয়। আমার নাম রাজেশ'' একথা বলে সে তার পরিচয় পত্র দেখাল। রাজেশ বলতে থাকেঃ

''আমাকে বিশ্বাস করো; আমি তোমাকে এই নোংরা নরক জীবন থেকে বাঁচাতে এসেছি। আমাকে তোমার সম্পর্কে সব খুলে বলো। তোমার বাড়ি কোথায় এবং কিভাবে এখানে এলে।''

''পুরুষকে বিশ্বাস? আমি এখানে, যেহেতু আমি এমন একজন মানুষকে বিশ্বাস করে ছিলাম যাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতাম। সময় নষ্ট করবেন না আপনি চলে যান। এই নিন আপনার টাকা।''

''দয়া করে আমাকে অবিশ্বাস কোরো না। তুমি কোনো মানুষের দ্বারা প্রতারিত হতে পার কিন্তু সব মানুষ ত তার মত নয়।''

''আপনি আমার সম্পর্কে এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন কেন এবং এখান থেকে উদ্ধার করতে চাইছেনই বা কেন? আমার পাশের ঘরে আমার এক বন্ধুকে আপনার মত কেউ এইরকম প্রস্তাব দিয়েছিল এবং সে তার বিয়ের প্রস্তাবে বিশ্বাস করে এবং তার সংগে চলে যায়। কিন্তু কি হল? এখান থেকে বেশী দূরে নয় তারা একটা ভাড়া বাড়িতে ছ মাসের মত ছিল। সে বলে নি কিভাবে সে দিনের বেলা টাকা রোজগার করত। সে সকাল বেলা ঘর থেকে বেড়িয়ে যেত এবং সন্ধ্যে বেলা রান্নার উপকরণ নিয়ে ঘরে ফিরে আসত। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে তাকে বিয়ে করে নি। একথা সেকথা বলে বিয়ের দিন পিছিয়ে দেয়। এর মধ্যে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অন্য দিনের মত একদিন সকালে সে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। এইভাবে প্রতারিত হয়ে সে আবার এই বাড়িতে ফিরে আসে, ভ্রূণ নষ্ট করে তার পেশায় ফেরে। এখন আপনি বলুন, আমি কি করে আপনাকে বিশ্বাস করি?''

''বোন, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমাদের মত ঘা খাওয়া মানুষের পক্ষে পুরুষকে বিশ্বাস করা খুব শক্ত। আমি তোমাদের বাঁচাতে এসেছি এই অর্থে যে তোমাদের বাঁচার পথ দেখাতে চাই। তুমি জানতে চেয়েছিলে কেন আমি তোমাদের নিয়ে

ভাবছি। এখন শোন তাহলে আমার ইতিহাস। আমার তোমাদের মত লোকের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কারণ আমি নিজে একজন যৌন কর্মীর সন্তান। যদিও এখন আমি প্রচুর সম্পত্তির মালিক। আমি এমন বাবার সন্তান যে মুম্বাই শহরে তার স্ত্রী এবং ছেলেকে ফেলে চলে গিয়েছিল। বেঁচে থাকার অন্য কোন বিকল্প না পেয়ে আমার মা এই কামাথিপুরাতে পতিতা বৃত্তিকে পেশা করতে বাধ্য হয়। আমাকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দেন তারপর আমার উচ্চ শিক্ষা এবং শেষ কালে বিদেশে চাকরী। বর্তমানে আমরা কোচির বাসিন্দা। আমার মায়ের ইচ্ছে, আমি যেন যৌন কর্মীদের জন্য কিছু করি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে ৫০০০ এর বেশী যৌন কর্মী আছে। এবং আমাদের দেশের নিরিখে এই সংখ্যাটা ৮০০০০০ ছাড়িয়ে যায়। যেহেতু আমি এমন মানুষ যে এই প্রকার পরিবারের মানুষদের জীবনের কষ্ট এবং যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচিত আমার দায়িত্ব তাদের এই নারকীয় জীবন থেকে মুক্ত করা। আমার মা গোবিন্দমিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমি আগেই বলেছি যদি তুমি চাও তুমি সেই কারখানায় কাজ করতে পার। শুধুমাত্র তুমি নও আমি তোমার আর কুড়ি জন বন্ধুকেও কাজ দিতে পারি। তোমাকে খুব ভাল বেতন দেব। কারখানার কাছাকাছি জায়গায় বসবাস করার কোয়াটারস আছে যেখানে তুমি তোমার পরিবার নিয়ে বাস করতে পারবে। সেই চত্বরে শিশু তত্ত্বাবধান কেন্দ্র এবং খেলার স্কুল আছে এবং সেখানে তোমার কখনোই একাকীত্ব বোধ হবে না, সেখানে বিচ্ছিন্নতা বা বৈষম্য অনুভব করবে না। এখন বলো কি করবে?"

"আপনাকে ভুল বোঝার জন্য খুবই দুঃখিত স্যার। আমি এই নোংরা পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে চাই। আমি আমার পরিচয় দিই। আমার নাম স্টেলা, একজন ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র মেয়ে। আমার মা একটা স্কুলের শিক্ষিকা। আমাদের বাড়ি থ্রিশুরে (কেরালা)। বিয়ে ক্লাসে পড়ার সময় আমি মুম্বাইয়ের এক ফেসবুকের বন্ধুর প্রেমে পড়ি। তার নাম রাজেন্দার। যদিও আমাদের সাক্ষাৎ দেখা হয় নি ফোনেই আমাদের ভালবাসা। সেটা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল ফেসবুকের মাধ্যমেই। একদিন আমরা ঠিক করলাম বিয়ে করব। কোন ভাবে আমার মা বাবা বিষয়টা লক্ষ্য করেন এবং কঠোর আদেশ দেন যে এই প্রেমের সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে হবে। আমি খ্রিস্টান কিন্তু সে ছিল হিন্দু এবং এটাই ছিল তাদের আপত্তির কারণ। সে (রাজেন্দার) আমাকে যেটুকু বলেছিল তাছাড়া আমি তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না। সে আমাকে বলেছিল যে সে ইঞ্জিনিয়র, একটা আই টি কোম্পানিতে চাকরী করে এবং মোটা বেতন পায়। আমার মা বাবা তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তারা আমাকে সাবধান করেন যে সে মিথ্যা বলতে পারে। আমি রাজেন্দারকে বাবা মায়ের আপত্তির

কথা বলেছিলাম। কি আর বলব ! একদিন রাজেন্দার থ্রিশুরে এসে আমাকে সেইদিন বিকেলের ট্রেনেই মুম্বাই যেতে বাধ্য করে। মা বাবাকে অগ্রাহ্য করে অন্ধ মোহে তার ইচ্ছের কাছে আমি নিজেকে এবং আমার ভবিষ্যৎকে সমর্পণ করেছিলাম। তার অনুরোধে আমার মোবাইল ফোনটা তাকে দিই। সে ফোনের সিম সরিয়ে নিয়ে তা নষ্ট করে দেয় এবং ট্রেন ছেড়ে দিলে তা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ট্রেন মুম্বাই পৌঁছাল পরের দিন। সে আমাকে একটা হোটেলের ঘরে নিয়ে যায়। আমরা সেখানে এক সপ্তাহ স্বামী স্ত্রীর মত ভালই ছিলাম। যদিও বাবা মায়ের বিষণ্ণ মুখের ছবি আমার মনকে অস্থির করে তুলত কিন্তু রাজেন্দারের প্রেমের কাছে তা হেরে যায়। সে সকাল ৯টায় অফিস চলে যেত এবং ফিরত সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে। এক সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে সে বলে যে তাকে সে রাত্রে কলকাতা যেতে হবে ব্যবসার কাজে এবং সপ্তাহ খানেক পর ফিরবে। সে বলে যে তার না ফেরা পর্যন্ত আমাকে তার বন্ধুর পরিবারে থাকতে যা সেখান থেকে বেশী দূরে নয়। সে আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে বলে। রাত্রি হয়ে আসছিল এবং চারদিক অন্ধকার। সে একটা ট্যাক্সি নেয় এবং আধঘণ্টা চলার পর ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায় একটা দোতলা বাড়ির সামনে। সে আমাকে গাড়ি থেকে নামতে বলে এবং একটা ঘরে নিয়ে আসে। সেখানে এক মধ্যবয়স্কা মহিলা আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। রাজেন্দার তাকে হিন্দিতে কিছু বলে যা আমি ঠিক বুঝি নি। সে আমাকে আশ্বস্ত করে যে সে যতক্ষণ না ফিরে আসে এই মহিলা এবং তার পরিবার আমাকে যথাযথ ভাবে দেখা শোনা করবে। তারপর সে ওই ট্যাক্সিতেই ফিরে যায়। তখন সেই মহিলা ইংরেজীতে আমার সংগে কথা বলা শুরু করলেন। তিনি আমার নাম এবং আমার বিশদ তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাকে আমার নাম এবং কোথা থেকে এসেছি বলেছিলাম। তখন তিনি বলেন যে যে বাড়িতে আমি এসেছি তা পতিতালয়। যে নিয়ে এসেছে সে এখানে আমাকে বিক্রি করে গেছে। একথা শুনে আমি জোরে চিৎকার করে উঠি 'আপনি আমাকে মিথ্যা বলছেন। রাজেন্দার কখনো আমাকে ঠকাবে না। সে আমাকে খুব ভালবাসে এবং আমরা বিয়ে করছি। সে কিভাবে আমাকে ফেলে যাবে এবং পতিতালয়ে বিক্রি করবে?' সেই মহিলা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলেছিলেন ''মাথা ঠান্ডা করো স্টেলা। তোমার রাজেন্দারের নাম রাজেন্দার নয়। সে পতিতালয়ের একজন অন্যতম দালাল। তুমি আর কোনদিন তাকে খুঁজে পাবে না। এই বাড়ি থেকে তুমি বাইরে যেতে পারবে না। পরিস্থিতিটা বোঝ। কুড়ি জন যৌন কর্মী এখানে বিভিন্ন ঘরে ভালই আছে। ক্রেতাদের থেকে তারা টাকা রোজগার করে, আমাদের ঘর ভাড়া দেয় এবং আয়েশ করে এখানে বাস করে। অনেকের ছেলে মেয়ে আছে। হস্টেলে থেকে

তারা স্কুলে পড়াশোনা করে। কেউ এখানে তোমাকে বাঁচাতে আসবে না। টাকা ছাড়া তুমি বাঁচবে কিভাবে? ইতিমধ্যেই তুমি তোমার প্রেমিকের দ্বারা শোষিত হয়েছ এবং তারপর প্রতারিত হয়েছ। যদি তুমি আমাদের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নাও তাহলে তুমি বাঁচতে পারবে, টাকা রোজগার করতে পারবে এবং সুখে জীবন কাটাতে পারবে। আমরা তোমাকে বিনা পয়সায় দু একদিন খেতে দেব। তারপর তোমাকে খদ্দের ধরতে হবে, রোজগার করতে হবে। গুরুত্ব সহকারে বিষয়টা নিয়ে ভাবো। আমি এখন বাইরে যাচ্ছি ঘণ্টা খানেক পর রাতের খাবার নিয়ে আসব।' একথা বলে মহিলাটি ঘরের বাইরে চলে গেলেন এবং দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিলেন। আমি খুব কেঁদেছিলাম, অনেক ক্ষণ কেঁদেছিলাম। মা বাবার কথা মনে পড়েছিল। তারা হয়ত এখনো আমার খোঁজ করছেন। তারা হয়ত পুলিসে খবর দিয়েছেন। যেহেতু রাজেন্দার বানানো নাম পুলিসের পক্ষে তাকে খুঁজে বার করা শক্ত। আবার যেহেতু আমার মোবাইল ফোন এবং সিম নষ্ট করে ফেলে ছিল আমাকেও মা বাবা খুঁজে পায় নি। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু নেব কিভাবে? আমার মনে হয় স্নেহময় বাবা মায়ের অভিশাপে আমার এই করুণ অবস্থা। আমার জীবনের সব শেষ হয়ে গেছে। এই রকম ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। আমি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভেবেছি — কিন্তু কিভাবে? আত্মহত্যা করার সাহস নেই। আমার মন আমার ছেলেবেলার কথা মনে করায় আমার মা বাবা কত স্নেহশীল ছিলেন ! — কত আনন্দের ছিল স্কুল এবং কলেজের দিন গুলো !--- সেইসময়ে রাজেন্দারের সংগে সুখের দিন গুলো এখন আমাকে কাঁটার মত খোঁচা দেয়। সেই সময় এক মহিলা দরজা খোলেন এবং রাতের খাবার টেবিলের ওপর রাখেন।

তিনি বলেন, 'অনুগ্রহ করে ডিনারটা সেরে ফেলো'।

স্টেলা উত্তর দেয়, 'এখন আমার খিদে পায় নি'।

'ঠিক আছে, যখন খিদে পাবে খেয়ে নিও। ও হ্যাঁ, তুমি কি ঠিক করলে? আমাদের সংগে মানিয়ে নেবে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু অনুগ্রহ করে আমাকে দুটো দিন সময় দিন যৌন কর্মী হয়ে কাজ শুরু করতে। তারপর আমি ক্রেতা নেব।'

নিশ্চিত ভাবে তুমি কাজের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নাও। তোমাকে এখানে সময় মত খাবার দেওয়া হবে। তোমার ব্যবহারের জন্য এই ঘরের সংলগ্ন বাথরুম আছে। ইন্টারকমের মাধ্যমে যখন প্রয়োজন হবে আমাকে ডাকতে পারবে ''তিনি ঘরের বাইরে চলে যান এবং বাইরে থেকে দরজার তালা বন্ধ করে দেন। এইভাবে যৌন

কর্মী হিসেবে আমার জীবন শুরু হল। নিঃসন্দেহে আমি এই জীবিকাকে ঘৃণা করি। পাঁচ বছর হল আমি এই ঘৃণ্য জীবন যাপন করছি। স্যার, এই হল আমার গল্প'' স্টেলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং তার চোখের জল বাঁধ মানল না।

''সত্যিই বেদনাদায়ক! যে ব্যক্তি তোমার সংগে প্রতারণা করেছে তার শাস্তি হওয়া উচিত। আমি তাকে খুঁজতে পুলিসের সাহায্য নেব এবং তাকে জেলে পাঠানোর চেষ্টা করব। তার আগে আমি তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদের যদি তারা চায় আমার কোচির কারখানায় নিয়ে নেব। আজ আমি সেখানে ফিরে যাচ্ছি এবং এক সপ্তাহ পরে আবার আসব। ইতিমধ্যে তুমি এখানে তোমার বন্ধুদের সংগে যোগাযোগ করে আমার তোমাদের উদ্ধার করার অভিপ্রায় খুলে বলো। এই বাড়ির মালিকের তোমাদের ছাড়তে আপত্তি হবে না বরং তিনি হয়ত খুশী হবেন তোমাদের মুক্ত করে দিলে ঘর খালি হবে এবং এখানে নতুন বাড়ি তৈরী হবে। এই হল আমার কার্ড। যখন চাইবে ফোন করতে পার। যদি তোমার সব বন্ধুরা আসতে ইচ্ছুক হয় আমি কোচি যাবার জন্য একটা বাসের ব্যবস্থা করে দেব। বিদায় স্টেলা ! আমি এর পরের শনিবার তোমার সংগে দেখা করব। তার আগে আমাকে ফোন কোরো এবং তোমার সংগে যারা আসতে চায় তাদের ফোন নম্বর দিও।'' রাজেশ ঘর থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে চলে গেল।

স্টেলা তার সব বন্ধু যৌন কর্মীদের সংগে কথা বলল। তারা সবাই খুশী মনে এই জায়গা ছেড়ে যেতে এবং কোচিতে সুস্থ জীবন কাটাতে চায়। স্টেলা রাজেশকে বলল যে তার কুড়িটা বন্ধুই তার সংগে যেতে ইচ্ছুক।

রাজেশ শনিবার দুপুরে কামাথিপুরা ফিরে আসে। স্টেলা এবং তার বন্ধুরা তাদের ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে ছিল। ইতিমধ্যে একটা বাস সেখানে আনা হয়। স্টেলা এবং তার বন্ধুরা তাদের ব্যাগ নিয়ে বাসে ওঠে। এইভাবে তারা তাদের অভিশপ্ত জীবনকে বিদায় জানিয়েছিল। ধরার স্বর্গ ধামের উদ্দেশ্যে সবাই এক সংগে রওনা দেয়। বাসটা কোচি পৌঁছল পরদিন এবং গোবিন্দ মিলে গিয়ে থামল। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা। ভিতরে ঢোকার প্রবেশ দ্বারে ফুল দিয়ে আর্চ বানানো ছিল। গোটা জায়গাটিতে ছিল উৎসবের পরিবেশ। অনেক মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছিল। স্টেলা এবং তার বন্ধুরা একে একে বাস থেকে নামে এবং রাজেশের মা যিনি কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফুলের তোড়া দিয়ে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এরপর তাদের কারখানা চত্বরে যেখানে মঞ্চ বাঁধা ছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। মঞ্চ ফুল দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো। প্রায় ৫০০ লোক - কারখানার কর্মী এবং

তাদের পরিবার খোলা মাঠে বসে ছিল। তারা মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসলে ওই সব লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দেয়। মঞ্চে কোচির মেয়র এবং কেরালা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছাড়া আরও কিছু সন্মানিত অতিথি ছিলেন। স্বাগত ভাষণে রাজেশ বিস্তারিত বলেন মুম্বাই থেকে আগত অতিথিদের কেন সে মানবিক পুনর্বাসন দেবার কাজ করছে। রাজেশের মা রাধাদেবী তার ভাষণে দর্শকদের এবং সমগ্র সমাজকে পৃথিবীর অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত এবং শোষিত মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে আহ্বান জানান। মেয়র তার সভাপতির ভাষণে রাজেশ, রাধাদেবী এবং গোবিন্দ মিলকে এই রকম অসাধারণ মানবিক কাজের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে এরা অবহেলিত, সমাজ পরিত্যক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য কাজ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে এই কোম্পানির ব্যতিক্রমী কাজ সব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের এবং কোটিপতিদের কাছে মডেল হওয়া উচিত। যে টাকা তারা সঞ্চয় করে পরোক্ষ ভাবে তা সমাজের টাকা। সুতরাং মানবিক কিছু কাজের মাধ্যমে সেই টাকার একটা অংশ সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তার ভাষণে বার বার স্মরণ করিয়ে দেন যে যৌন কর্মীদের হেয় দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য যৌন লাঞ্ছনা এবং শোষণ করে তাদের গাছের পাতার মত মনে করা চরম নিষ্ঠুরতা এবং ক্ষমার অযোগ্য। সর্বোপরি তারা কি তোমাদের নিজের বোন নয়? স্টেলা তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক ভাষণে তাদের দুঃখের সাগরে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য রাজেশ এবং তার মা রাধাদেবীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

প্রতিশ্রুতি মত কুড়িটি মেয়েকেই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করা হয়। ২০০০০ থেকে ২৫০০০ টাকা তাদের বেতন দেওয়া হয়। তাদের সবাইকে বিনা মূল্যে থাকার জন্য কোয়াটার্স দেওয়া হয়। সস্তায় ফ্যাক্টরির ক্যান্টিন থেকে তাদের খাবার বন্দোবস্ত হয়। মুম্বাইতে যাদের ছেলেরা স্কুলে পড়াশোনা করত তাদের কোচিতে নিয়ে এসে ফ্যাক্টরির কাছাকাছি সরকারী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এইভাবে তাদের স্বর্গ তৈরি হল এবং তারা অনেক আশা প্রত্যাশা নিয়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে তাদের নতুন জীবন শুরু করল।

একজন মহৎ পরার্থপর ব্যক্তি
A Good Samaritan

আমি এমন এক ঘটনার বর্ণনা করতে যাচ্ছি যার তিন ভাগ সত্যি এবং বাকীটুকু একটা ছোট গল্প তৈরির প্রয়োজনে কল্পনা আশ্রিত। ভারতবর্ষের কেরালার এক শহরে এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

থ্রিশুরে একটা সেমিনারে যোগ দেবার জন্য জাতীয় সড়ক ধরে আমি আমার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। গাড়ি, বাস, ট্রাক রকেট গতিতে পথের কাল ফিতে ধরে ছুটছিল। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল এবং গাড়ির আলো গুলো মিশাইলের মত বেগে ছুটে চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। হঠাৎ আমি দেখি একজায়গায় একজন মানুষ রাস্তার বাঁদিকে একটা জড় পদার্থের মত পড়ে। আমি আমার গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে ব্রেক কষে গাড়ি থামালাম। দেখলাম একজন মানুষ অচৈতন্য হয়ে শুয়ে এবং তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমি তার পালস অনুভব করি এবং বুঝি এখনো প্রাণ আছে। লোকটা রোগা, বয়স বছর ষাট হবে। আমি তাকে আমার সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে আমার গাড়িতে তুললাম। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আমি থ্রিশুর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে কাছাকাছি এক হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। একটা গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয় এবং রাস্তার পাশে সে ছিটকে পড়ে।

পরিণাম বুঝে ভয়ে গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। আজকালকার দিনে শহুরে সমাজে এইরকম পাষাণ হৃদয়ের লোকের ছড়াছড়ি। তাদের বৈশিষ্ট্য হল তারা স্বার্থপর, গলা কাটা খুনী। দুর্ঘটনায় জখম ব্যক্তিকে থ্রিশুরের অমলা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। নার্সরা দৌড়ে এল। আমি তাদের বলি যে তাকে কিভাবে দেখেছি এবং এখানে তুলে এনেছি। জখম ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে ডাক্তার আমাকে জানালেন যে রোগীর অবস্থা সংকটজনক। তার মস্তিস্কে বড় রকমের আঘাত আছে। এখনি অপারেশন করা জরুরী। আমি তাকে বলি যে আহত ব্যক্তির জীবন বাঁচানোর জন্য যা যা করা প্রয়োজন করুন। আমি কাগজ পত্রে সই করে দিলাম যেহেতু তার কোন

আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিল না। আমার ব্যাগ থেকে অপারেশনের খরচ হিসেবে অগ্রিম ১০,০০০ টাকা দিই। রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার আগে আমি ডাক্তারকে বলি যে তারা যদি ওই ব্যক্তির পরিচয় কিছু উদ্ধার করতে পারেন। ডাক্তার তার পকেট থেকে একটা ছোট মানি ব্যাগ পায়। আহত ব্যক্তির পরিচয় সমেত একটা ফোন ডায়েরী সেই ওয়ালেটে ছিল।

তার পরিচয় কার্ড থেকে আমি জেনেছিলাম যে তার নাম মিস্টার জেভিয়ার, বাস ছবকদ, যেটা থ্রিশুর থেকে বেশী দূরে নয়। ফোনের বইটি আমাকে তার বাড়িতে জানাতে সাহায্য করে।

''হ্যালো, এটা কি জেভিয়ারের বাড়ি?'' আমি আমার মুঠো ফোন থেকে জানতে চেয়েছিলাম।

এক মহিলা কণ্ঠ উত্তর দেয়, ''হ্যাঁ অনুগ্রহ করে বলবেন, আপনি কে?''

''আমি প্রফেসর মোহন। আপনি আমাকে চেনেন না। আপনি কি জেভিয়ারের স্ত্রী?''

''হ্যাঁ, কি হয়েছে?''

''তার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তাকে থ্রিশুরে অমলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘাবড়ানেন না। চিন্তা করবেন না। গুরুতর কিছু হয় নি। অনুগ্রহ করে হাসপাতালে চলে আসুন।''

''যীশু, আমার স্বামীকে রক্ষা কোরো ! আমি শীঘ্রই আসছি,'' তার গলা ধরে যাওয়ার শব্দ আসে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে জেভিয়ারের স্ত্রী মরিয়ম সেখানে পৌঁছায়, সঙ্গে ডজন খানেক লোকজন। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না এবং জোরে জোরে কেঁদে উঠছিল। তার চোখে জলের ধারা নামে। তার অনুরোধে তাকে বলি কি ঘটেছিল। সে যীশুর কাছে কেঁদে তার স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য মিনতি করে। মরিয়ম, তার দুই মেয়ে এবং জেভিয়ারের মা বাবার কান্নার রোল অপারেশন থিয়েটারের সামনের বারান্দায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আমি তাদের শান্ত করার চেষ্টা করি, কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত। ইতিমধ্যে আরও অনেক লোকজন সেখানে ভিড় করে। সেখানে নারী পুরুষ মিলিয়ে জনা পঁচিশেক লোক জড়ো হয়ে তার জীবনের জন্য প্রার্থনা করে।

আমি বিস্ময়ে অভিভুত হই কিভাবে অতি সাধারণ দেখতে একজন লোক এত

জন মানুষকে তার জন্য প্রার্থনায় উদবুদ্ধ করতে পারে, তার জীবনের জন্য ভাবাতে পারে। তাদের ফোঁপানি এবং কান্নায় করিডরের দেওয়াল কেঁপে ওঠে। নার্সরা অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে, একজন নার্স অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। আমি ডাক্তারের কাছ থেকে শুভ খবরের প্রতীক্ষায় ছিলাম। ঈশ্বরের কাছে জেভিয়ারকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে ছিলাম। ডাক্তার আমাকে বলেন যে অপারেশন সফল। জেভিয়ার সঙ্কট জনক অবস্থা কাটিয়ে বেঁচে গেছে। কিন্তু সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে কিনা অনিশ্চিত। মস্তিস্কে আঘাত পেয়েছে সম্ভবত সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবে সেই সংগে তার অতীত স্মৃতি হারিয়ে যাবে।

এই খবরটা বাইরে অপেক্ষারত জেভিয়ারের আত্মীয় স্বজনকে যদি দেওয়া হয় আমি কল্পনায় দেখতে পাই কি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হবে। মরিয়ম অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং তাকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। সেজন্য আমি ডাক্তারকে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে রোগীর অবস্থার কথা বলতে বলি। এতে রোগীর পরিণতির ব্যাপারটা আড়ালে থাকবে। সেই অনুযায়ী ডাক্তার তাদের সামনে এলেন এবং বলেন যে জেভিয়ারের মস্তিস্কে সামান্য আঘাত লেগেছিল, সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে ছিল তা সফল ভাবে সরানো হয়েছে। আশা করা যায় সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এ কথা শুনে মরিয়ম সমেত লোকজন হাফ ছাড়ল এবং কান্নাকাটি বন্ধ হল।

আমার মনে কৌতূহল জাগে জেভিয়ারের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে লোকজন কেন এত উদ্বিগ্ন। অদম্য ইচ্ছার ফলে আমি নিজে থেকে সেখানে আরও কিছুটা সময় থেকে যাই। সর্বোপরি, সে রাতে আমার আর কিছু করার ছিল না, শুধুমাত্র থ্রিশুরে হোটেলে ঘুমানো ছাড়া কারণ সেমিনার ছিল পরের দিন।

''মরিয়ম, দয়া করে আমাকে বলুন কোথায় আপনার বাস এবং এই সব লোকজন কে?''

''স্যার, আমার স্বামীর জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি দেবদূত, যীশু আপনাকে পাঠিয়েছেন,'' ভাঙা গলায় সে উত্তর দেয়।

আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি তাদের দুঃখ সহ্য করার শক্তি প্রদান করতে। হে ঈশ্বর, তারা ডাক্তারের কাছ থেকে মিথ্যা আশ্বাস পেয়ে স্বস্তি পেয়েছে। এক সময় তারা সত্যটা জানবে, তারা সেইসময় কি প্রতিক্রিয়া করবে?

''আমরা ছবকদে থাকি, আমার স্বামী জেভিয়ার, এই দুই মেয়ে এবং এনারা হলেন মা বাবা। দুই মেয়ে লিজ এবং গ্রেস অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে।''

''আপনাদের জীবিকা কি?''

''আমাদের দুই একর চাষের জমি আছে আমরা এর ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি।''

''এবং এই সব লোকজন কে?''

তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উত্তর এল।

''আমি বেণু গোপাল। পাঁচ বছর আগে আমি পথ দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম যদি না জেভিয়ার ছেট্টান (বড় ভাই) আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন তাহলে এখন আমি অন্য জগতে থাকতাম।''

''আমার ও এই রকম ঘটেছিল। আমার নাম আকবর। আমি যখন বাইকে করে যাচ্ছিলাম একটা ট্রাক আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে এবং ছিটকে ফেলে দেয়। দেবদূতের মত জেভিয়ার ছেট্টান এগিয়ে আসেন এবং হাসপাতালে নিয়ে যান। আমি আমার জীবনের জন্য তার কাছে ঋণী।''

''আমি যোশেফ। তিন বছর আগে, যখন আমি সবজি গাড়ি নিয়ে হাইওয়ে ধরে যাচ্ছিলাম একটা ট্রাক আমাকে এবং আমার গাড়িকে থেঁতলে দিয়ে চলে যায়। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। যখন আমি চোখ খুলি আমি হাসপাতালের বিছানায়। আমাকে তুলে নিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন এই মহৎ মানুষ জেভিয়ার। বাস্তবিক তিনি হলেন ত্রাতা তার নামই তাই বলে।''

''স্যার'' মরিয়ম অন্যদের হয়ে বলতে থাকেঃ ''এদের কাছ থেকে যা শুনলেন সব সত্যি। আমার স্বামী অ্যাকসিডেন্টের ঘটনায় যাদের জীবন বাঁচিয়েছেন এই কয়েকটা অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে কয়েকটা মাত্র। আট বছরে তিনি পাঁচশ দশ জন পথ দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জীবন বাঁচিয়েছেন। আমরা এই কাজকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছি। যারা দুর্ঘটনায় পথে অবহেলায় পড়ে থাকে তাদের তুলে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচাই। আমি এবং আমার মেয়ে অ্যাকসিডেন্টে আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে সেবা দিতে স্বামীকে সাহায্য করি। অনেক ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তির আত্মীয়েরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমাদের নিজেদের হাসপাতালের বিল মেটাতে হয়। ঊনপঞ্চাশ জন জখম ব্যক্তি রাস্তায় হাসপাতাল যাবার পথে আমার স্বামীর কোলেই মারা গেছেন। সেই দিন গুলো আমার স্বামীর কাছে অস্বস্তি দায়ক ছিল ! তিনি কিছু খেতে পারতেন না এবং আমি তার গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রু ধারা মুছিয়ে দিতাম।'' মরিয়মের

চোখ দুটো জলে ভরে গেল এবং সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটা রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

''মরিয়ম, কাঁদবেন না। ঈশ্বর আপনাকে দেখবেন'' আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

''হ্যাঁ স্যার, যীশু কিভাবে আমাদের ভুলবেন? আমরা এত কিছু করেছি তিনি আমার স্বামীকে এমন শাস্তি দিলেন?'' সে ফোঁপাতে শুরু করে।

''ঈশ্বর কখনোই আপনাকে শাস্তি দেবেন না, মরিয়ম। তিনি (ঈশ্বর) তাঁর সৃষ্টিকে শুধুই ভালবাসেন এবং এবং কখনোই শাস্তি দেন না।''

''হ্যাঁ স্যার, আমিও তাই বিশ্বাস করি। আগে আমার স্বামী বেসরকারী বাস কোম্পানিতে কাজ করতেন। তিনি তখন এই রকম অসংখ্য অ্যাকসিডেন্ট দেখেছেন যেখানে জখম ব্যক্তিরা অবহেলায় পড়ে থাকে। তারপর ২০০০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী আমি আমার একমাত্র ছেলে উইলিয়মকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটার সময় একটা অটো রিক্সা পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। সংগে সংগে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় কিন্তু আট দিনের মাথায় সে চিরতরে আমাদের ছেড়ে চলে যায়। সেই সময় তার বয়স ছিল মাত্র বারো।'' সে কান্না চাপতে পারে না। মরিয়ম কয়েক মিনিট ধরে ফোঁপাতেই থাকে। তারপর আবার বলতে শুরু করে।

''আমার ছেলের সেই করুণ পরিণতি আমার স্বামীকে এই ধরণের মানবিক সেবায় যুক্ত হতে উৎসাহিত করে। প্রতিদিন সকাল ১০-৩০ থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত গুরুভয়ুরে থাকতেন অ্যাকসিডেন্টে জখম ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য। দুপুর ২-৩০ থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত তাকে পাওয়া যেত কুন্নমুকুলমে। প্রায়শ আমার স্বামীকে পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হত হাসপাতালে জখম ব্যক্তিদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য। যার ফলে আমরা প্রায়ই উপবাস করতাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখন বিদেশে বসবাসকারী আমার দেওর এবং আমার নিজের মা বাবা এই কাজে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।''

''আপনার স্বামীকে নিয়ে ঈশ্বরের আরও অনেক পরিকল্পনা আছে, মরিয়ম। সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। বাস্তবিক, ইনি হলেন বাইবেলের সেই মহৎ পরার্থপর মানুষ।''

''হ্যাঁ স্যার, আমরা নিশ্চিত যে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন।'' এই কথাগুলো সেখানে সমবেত হওয়া সব লোকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এবং তা এই বারান্দা থেকে ওই বারান্দায় প্রতিধ্বনিত হয়। সন্দেহ নেই, ঈশ্বর এখানে অলৌকিক কিছু করবেন, আমার মন অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে।

আদর্শ সরকারী কর্মচারী
Best Government Servant

জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন ! ডঃ কৃষ্ণান নাম্বুদ্রি কেরালা রাজ্যের একটা ছোট শহরে সরকারের তালুক অফিসে অধস্তন কেরাণী পদে চাকরীর নিয়োগ পত্র পেয়েছেন। তার বয়স ৩৮। যদিও এই পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল এস এস এল সি (SSLC) দশ ক্লাস পাশ। কিন্তু কৃষ্ণান এম এ, এম ফিল, গান্ধী বিষয়ে গবেষণা করে পি এইচ ডি। ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম যাদের অতীতে একসময় প্রচুর ধন সম্পদ ছিল। তার মা বাবা জীবিত এবং তারা কৃষ্ণানের সংগেই থাকেন। তারা উত্তরাধিকার সুত্রে মাত্র এক একর জমি পেয়েছেন। কৃষ্ণানের বাবা অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। তার কষ্টার্জিত জমানো টাকা দুই মেয়ের বিয়ে দিতে খরচ হয়ে গেছে।

তালুক অফিসের সরকারী চাকরীতে যোগ দেওয়ার জন্য কৃষ্ণান বাসে একটা ভাল সীটে আরাম করে বসে এবং এই পর্যন্ত জীবনের পথ চলা নিয়ে নানা কথা ভাবতে শুরু করে। গন্তব্যে পৌঁছতে ঘণ্টা খানেক লাগবে - যা তার স্মৃতিচারণের জন্য অনেকখানি সময়। কৃষ্ণান তার পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক মনোরম স্থানে ভ্রমণ করেছে। পড়াশোনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ের পর থেকে তার জীবনের তিক্ত, ক্ষত বিক্ষত, কন্টকাকীর্ণ পথ চলা শুরু। আদর্শ ব্রাহ্মণের সব গুণ তার বাবার মধ্যে ছিল। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ - সৎ, ছাত্রদের প্রতি, সহকর্মীদের প্রতি এবং প্রতিবেশীদের প্রতি আন্তরিক, দায়িত্বশীল এবং সহানুভূতিশীল। তিনি জীবনে কখনো মিথ্যা বলেন নি।

কৃষ্ণানের মা ছিলেন গৃহবধূ এবং বাবার মতই উদার, সহানুভূতিশীল এবং প্রতিবেশীদের সাহায্যে সবসময় এগিয়ে যেতেন। কৃষ্ণান এস এস এল সি (SSLC) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে। এরপর তার প্রাক্ স্নাতক কোর্সের জন্য থড়ুফুজার নিউম্যান কলেজে ভর্তি হয়। গান্ধীবাদী পিতা ছিলেন তার কাছে আদর্শ। কৃষ্ণান ছোটবেলা থেকেই বাবার গান্ধীবাদী চিন্তাধারা এবং জীবনচর্যার প্রতি

আকৃষ্ট ছিল। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মহৎ মূল্যবোধ তাকে বিশেষ এক প্রকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে এবং তার জীবনের পথ প্রদর্শক হয়। কৃষ্ণানের ইচ্ছে ছিল গান্ধীর দর্শনের ওপর পি এইচ ডি (Ph.D.) করার। প্রাক স্নাতক কোর্সেও সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে। এই কোর্সের পর সে ইতিহাসে বি এ পাশ করার জন্য ভর্তি হয় নিউম্যান কলেজে।

সে ছাত্রদের সংগঠন এস এফ আই (SFI) বা ভারতীয় ছাত্র পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই দল ছাত্রদের অধিকার গুলো আদায়ের চেষ্টা করে। সে ভাল বক্তা ছিল। তার মৌলিক সদগুণ এবং মূল্যবোধ তাকে কলেজ ইউনিয়নের সভাপতি হতে সক্ষম করে। যদিও এস এফ আই ছিল বাম ধারায় পুষ্ট কৃষ্ণান কলেজে হিংসা এবং অহেতুক বনধের বিপক্ষে ছিল। সে অনেক নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক হয় এবং কোট্টামে মহাত্মা গান্ধী ইউনিভারসিটিতে গান্ধী বিষয়ক ভাবনার বিভিন্ন আঙ্গিক এবং উন্নয়ন নিয়ে এম এ পড়বার জন্য ভর্তি হয়। বৃত্তির যে টাকা সে পেত তা তার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং তা তার বাবাকে ছেলের পড়াশোনার খরচের ব্যাপারে স্বস্তি দিয়েছিল। কৃষ্ণান পড়াশোনায় খুবই মেধাবী ছিল এবং শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র ছিল। এম এ পাশের পর সে এম ফিল পড়ার জন্য সেখানেই ভর্তি হয় এবং তারপর পি এইচ ডি ও সেখান থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছ বছরের ছাত্র জীবন ছিল জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপম সুন্দর জীবন শেষে ভবিষ্যতের বাস্তবের সব চ্যালেঞ্জ গুলো তার সামনে আসে। তার মত গরীব ঘরের যুবকের কাছে পড়াশোনা হল জীবিকা অর্জনের উপায়। কিন্তু কেরালার মত রাজ্যে শিক্ষার হার ৯৫% এবং বেকারের হার ১৫ % । সাংঘাতিক কিছু স্বপ্ন দেখার সুযোগ তার ছিল না। একজনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতার মাপকাঠিতে মাত্র নিয়োগ হয় না বরং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব কে কতটা খাটাতে পারে তার ওপর তা অনেক খানি নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণানের টাকা বা রাজনৈতিক যোগাযোগ কোনটাই ছিল না। তার বাবা ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন এবং সামান্য বার্ধক্য ভাতাই ছিল পরিবারের একমাত্র আয়, বেঁচে থাকার অবলম্বন। কৃষ্ণান পরিবারকে সাহায্য করার জন্য চাকরী খুঁজতে বাধ্য হয়।

যে সব কাজের জন্য সে যোগ্য ছিল নিম্নতম থেকে উর্ধতম অফিসার পদের জন্য আবেদন করে। সরকারী লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং নিয়োগ হতে অনেক সময় লাগে এমনকি বছরের পর বছর। সে নীচু ক্লাসের ছাত্র এবং উচু ক্লাসের ছাত্রদের গৃহ শিক্ষকতা করা স্থির করে। ইংরেজী ভাষায় তার কিছুটা দক্ষতা ছিল। সে স্কুল এবং টিউটোরিয়াল সেন্টারের ছাত্রদের গৃহ শিক্ষকতা করত। সে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের পড়াতে পারত কিন্তু ছাত্রদের তা প্রয়োজন হত না। ইংরেজী

সবসময় সাধারণ ভারতীয় ছাত্রদের কাছে আতঙ্কের মত। সেজন্য স্কুলের সময়ের পরে সকাল সন্ধ্যায় অনেক ছাত্র পড়ানোর সে সুযোগ নেয়। দিনের শুরু থেকে সকাল ৯টা এবং ৪টে ৩০ থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত কৃষ্ণান ছাত্রদের বাড়ি গিয়ে পড়াত। পাশাপাশি টিউটোরিয়াল সেন্টারে সে ১০টা থেকে ৪টে ইতিহাস এবং ইকনমিক্স পড়াত। এই সব ক্লাস করে সব মিলিয়ে প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা রোজগার হত।

বছরের পর বছর অতিক্রান্ত। সরকারী চাকরীর জন্য কৃষ্ণানের প্রতীক্ষা এবং প্রার্থনা ঈশ্বরের নজরে পড়ে নি। কৃষ্ণানের বয়স তিরিশ হয়ে গেছে। তার মা আরথ্রাইটিসে প্রায় শয্যাশায়ী। সৌভাগ্য ক্রমে বাবা ছিলেন যথেষ্ট শক্ত সমর্থ। সাংসারিক দায়িত্ব পালন, রান্না বান্না, ঘর পরিষ্কার করা এইরকম খুঁটিনাটি কাজ করতেন। পরিবারের এমন অবস্থা ছিল না যে একজন পরিচারিকা রাখবে কারণ তাকে কম করে ১০০০০টাকা প্রতি মাসে বেতন দিতে হবে। কৃষ্ণানের বাবা মা তাকে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করে কিন্তু কৃষ্ণান উত্তর দেয়, ''বাবা, এই পরিবারের সদস্য আরও একজন বাড়লে আমি কি ভাবে সামলাবো যেখানে আমার রোজগার অতি সামান্য? স্বনিযুক্ত ব্যক্তি হয়ে সরকারী চাকুরে স্ত্রী আমি আশা করতে পারি না। এ ছাড়া মায়ের চিকিৎসার জন্য আমাদের অতিরিক্ত খরচ আছে।''

''ঠিক আছে, খোকা, তুমি যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই হবে,'' বাবা বলেন।

''কিন্তু আর কতদিন তুমি একা থাকবে, খোকা? ইতিমধ্যে তোমার তিরিশ হয়ে গেছে,'' মা স্মরণ করিয়ে দেন।

''অপেক্ষা করি মা। হতে পারে বছর খানেকের মধ্যে সরকারী চাকরী একটা পেয়ে যাব। আমি অনেক গুলো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়েছি!''

উত্তরে মা গভীর শ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করেনঃ ''প্রভু কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা কোরো!''

সরকারী চাকরী পেতে কৃষ্ণানের আরও কিছু সময় কেটে যায়। কৃষ্ণান তেত্রিশ বছরে প্রবেশ করে। মায়ের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে এবং বাবারও বার্ধক্যের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণান বিয়েতে সম্মতি দেয়। একজন আদর্শ যুবক হিসেবে সে পণপ্রথার বিপক্ষে ছিল। সে চায় গরীব এবং এম এ পাশ করা একটি মেয়েকে বিয়ে করতে। সে জাতপাত প্রথা মানত না। সে চায় তার বউ অনগ্রসর সম্প্রদায়ের হবে। সৌভাগ্যক্রমে তার বাবা মা তার ইচ্ছার এবং মতের বিরুদ্ধে যান নি। সে পারিবারিক, জীবিকা এবং আর্থিক অবস্থা বিশদ ভাবে জানিয়ে কেরালা ম্যাট্রিমোনিয়াল ডট কমে নাম নথি ভুক্ত করে। পাত্রীর গুণাবলী এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তার প্রত্যাশাও জানিয়ে দেয়।

স্বনিযুক্ত যুবক হিসেবে বিয়ের বাজারে সে বেশী দামী পাত্র ছিল না কিন্তু তার

প্রত্যাশা অনুযায়ী দরিদ্র মেয়েদের কাছে গ্রহণ যোগ্য কিছু প্রস্তাব এসেছিল। সে সীতা নামের একটি মেয়েকে নির্বাচন করে। সে যথেষ্ট সুশ্রী এবং ইংরেজী সাহিত্যে এম এ। সেও তারই মত বেকার এবং কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পড়ায়। খুবই অনাড়ম্বর ভাবে কৃষ্ণান এবং সীতার বিয়ে তার বাড়ির কাছেই রেজিস্ট্রি অফিসে হয়। আমন্ত্রিত কিছু অতিথি এবং বন্ধুদের নিয়ে সাধারণ ভাবে এক হোটেলে ডিনারের আয়োজন সম্পন্ন হয়।

কৃষ্ণান গৃহ শিক্ষকতা এবং টিউটোরিয়াল সেন্টারে পড়ানো চালিয়ে যায় এবং সীতা বাড়িতে গৃহবধূ থেকে সংসারের সব কাজ কর্ম এবং শাশুড়ি মায়ের সেবা শুশ্রূষা করে। কৃষ্ণানের সরকারী চাকরী পাওয়ার আশা ক্ষীণ হয়ে আসছিল। কিন্তু হাল না ছেড়ে তবুও সে আবেদন করতে থাকে কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায়। পরীক্ষা গুলো কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছিল যাতে করে লাখ লাখ আবেদন পত্র থেকে হাতে গোনা কয়েক জনকে রেখে অধিকাংশকে বাতিল করা যায়। কৃষ্ণান এবং সীতার বিয়ের দুবছর পর একটি মেয়ে জন্মায় এবং আরও তিন বছর পর একটি ছেলে জন্মায়। অদৃষ্ট কৃষ্ণানকে আঘাত করতেই থাকে সীতার সিরোসিস অফ লিভারের লক্ষণ দেখা দেয়। চিকিৎসা ব্যয় সাপেক্ষ এবং কৃষ্ণান ব্যাংক থেকে ধার নেয় তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বন্ধক রেখে।

অবশেষে ঈশ্বর কৃষ্ণানের দিকে মুখ তুলে চাইলেন এবং তার পরিবারের প্রার্থনা শুনলেন। আট ত্রিশ বছর বয়সে অর্থ দফতরে অধস্তন কেরাণী হিসেবে সে নিয়োগ পত্র পেল। হতে পারে সর্বোচ্চ বয়স সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল বলে কর্তৃপক্ষ তার প্রতি সদয় হয়েছিল। ৩৬ বছরের পর কেউ পি এস সি পরীক্ষার জন্য আবেদন করে না। পিওন এক শনিবার নিয়োগ পত্র নিয়ে আসে যখন কৃষ্ণান ঘরে ছিল। যে টিউটোরিয়াল সেন্টারে সে পড়াত তা শনিবার বন্ধ ছিল। খামটা খুলে সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। আনন্দ সংবাদটি সে মা বাবা এবং স্ত্রীকে জানায়। তারাও সবাই খুব খুশী হয়।

কৃষ্ণান শহরে পৌছে বাস থেকে নামে। ঘড়িতে তখন সকাল ৯-৩০। সে একটা অটো রিক্সা করে তালুক অফিসে পৌছায়। অফিস খোলা ছিল কিন্তু কেউ সেখ ানে ছিল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করে। ১০টা নাগাদ একজন একজন করে কর্মচারী অফিসে ঢোকে। যখন তারা তাদের চেয়ারে বসে দরজার কাছে বসা একজনের কাছে কৃষ্ণান যায়। তার সামনের টেবিলে একগাদা ফাইল রাখা ছিল।

সে তার নিয়োগ পত্র দেখিয়ে বলে, ''স্যার, আমি এই অফিসে অধস্তন কর্মচারী হিসেবে কাজে যোগ দিতে এসেছি''।

''যান, তহসিলদারের সংগে দেখা করুন।'' ঐ তার ঘর।

কৃষ্ণান তার ঘরে যায় এবং পলিতকেশ ট্যাক্স অফিসারকে অভ্যর্থনা জানায়।

''শুভ সকাল স্যার। আমার নাম কৃষ্ণান নাম্বুদ্রি এবং এই অফিসে কাজে যোগ দিতে এসেছি'' সে নিয়োগ পত্রের অর্ডারটি তার হাতে দেয়।

নিয়োগ পত্রের অর্ডারটি দেখে তহসিলদার তাকে বসতে বলেন। তিনি কৃষ্ণানের বাড়ি কোথায় জানতে চান। তারপর তিনি অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টারটি নিয়ে কৃষ্ণানের নামটি লিখে তাকে সই করতে বলেন।

''কৃষ্ণান, এই অফিসটি খুবই ঠিকঠাক চলছে, লোকজনের কোন অভিযোগ ছাড়াই। সুতরাং আর সকলে যে ভাবে দায়িত্ব পালন করে আপনিও খুব দ্রুত সেই ভাবে কাজ করবেন। আমাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় আছে এবং সেইটাই আমাদের সাফল্যের চাবি কাঠি। ফাইল পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার যদি কিছু জানার থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন অথবা আশেপাশের টেবিলের বিভাগীয় কর্মীকে জিজ্ঞাসা করবেন।''

''অবশ্যই স্যার, আমি দায়িত্ব নিয়ে আমার কাজ করব'' কৃষ্ণান উত্তর দেয়।

তখন তহসিলদার দপ্তরীকে ডেকে তার চেয়ার দেখিয়ে দিতে বলেন। সে কৃষ্ণানকে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে যায়। টেবিলটাতে স্তূপাকৃতি নোংরা ফাইল। এইভাবে কৃষ্ণানের অফিস জীবন শুরু হল। সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা তাদের নিজেদের পরিচয় দেয় এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

কৃষ্ণান তার দপ্তরের কাজ খুব সহজেই শিখে নেয়। তার দপ্তরের কনিষ্ঠ আধিকারিক ছিলেন অল্প কথার মানুষ যদিও বিরক্তিকর চরিত্রের। তার মুখ থেকে কখনো মধুর কথা বেড়োত না।

একমাস পর কৃষ্ণানের অন্য সহকর্মীদের সংগে মেলামেশায় জড়তা কেটে যায় এবং সে তাদের চরিত্রের মূল্যায়ন করতে পারে। অফিসে সেই একমাত্র পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ধারী ছিল। সে দেখেছিল সব কর্মচারীই কাজের ব্যাপারে অলস এবং উৎকোচ পেতে আগ্রহী। সে কয়েক দিন দেখে দপ্তরী অন্য কর্মীদের হাতে ছোট মুখ বন্ধ খাম দিচ্ছে। সে অনুমান করে যে খামের মধ্যে টাকা আছে যেহেতু পার্শ্ববর্তী কেরানীদেরকে বলতে শুনেছিল যে কত আছে এতে।

এক সপ্তাহ পরে বিকেল ৪টেতে সে দেখে দপ্তরী মুখ বন্ধ খাম বন্টন করছে এবং সে কৃষ্ণানকেও একটা দেয়। কৃষ্ণান দপ্তরীকে জিজ্ঞাসা করে ''এটা কি রাজু?''

''এটা কোন এক মহৎ প্রাণ ক্রেতার দেওয়া বখশিশ, স্যার।''

''দুঃখিত, আমি এটা নেব না। আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আমি কোন উপহার চাই না।''

''স্যার, এটাই এই অফিসের রীতি। প্রত্যেকেই তার ভাগ পায়।''

''আমি এটাকে উৎকোচ বলি এবং আমি এই প্রকার উৎকোচ গ্রহণের বিপক্ষে।''

''সেক্ষেত্রে আমাকে তহসিলদারকে সব জানাতে হবে। স্যার, আপনি যদি এটা না নেন আপনাকে বদলী করা হতে পারে। কয়েক বছর আগে এক মহিলা কর্মীর ও তাই হয়েছিল।''

''দুঃখিত, আমার বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না।''

পিওন তহসিলদারকে বিষয়টা জানায় এবং সেই মুহূর্তে কৃষ্ণানকে তার কাছে ডাকা হয়।

তহসিলদার বলেন, ''ভগবান কৃষ্ণের মত সাধু হোয়ো না কৃষ্ণান। আমি তোমাকে একদম প্রথম দিনেই বলেছিলাম যে তোমাকে আমাদের সংগে সহযোগিতা করতে হবে এবং সমন্বয় রেখে চলতে হবে। এই সামান্য টাকা ক্রেতারা খুশী হয়ে আমাদের দেয় তাদের কাজ করে দেওয়ার জন্য। আমরা তাদের কাছে কোন ফি বা পুরস্কার চাই না।''

''দুঃখিত স্যার, আমি এটাকে উৎকোচ বলি। না চাইতে যদি তারা দিয়ে থাকে আমরা সেটা নিতে বাধ্য নই। সরকার আমাদের কাজের জন্য বেতন দেয়। আমি মনে করি এটা জনগণের ট্যাক্সের মাধ্যমে দেওয়া টাকা যা আমরা বেতন হিসেবে পাই এবং আমরা তাদের জন্য কাজ করতে দায়বদ্ধ।''

''আমি তোমার সংগে তর্ক করতে চাই না। এই অফিসে বাইশ জন কর্মচারী আছে তাদের কেউ এটাতে দোষের কিছু আছে বলে মনে করে না। যদি তুমি এই অফিসের প্রচলিত রীতির বিপক্ষে যাও তাহলে তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে।''

''দুঃখিত স্যার, আমি এটা মানতে পারছি না। আমার বিবেক এই কাজ সমর্থন করে না।''

''ঠিক আছে। তুমি তোমার চেয়ারে চলে যাও।''

কৃষ্ণান হতাশ হয়ে তার চেয়ারে গিয়ে বসে। এরপর একে একে অন্য দপ্তরের কর্মীরা তার কাছে এসে মত পরিবর্তন করতে বলে। আধিকারিকেরা তাকে ডেকে পরামর্শ দেন। কিন্তু সে তার মত পরিবর্তন করে নি এবং মুখ বন্ধ খাম নেয় নি।

বাড়ি ফিরে সে মা বাবা এবং স্ত্রীকে গোটা ঘটনাটি বলে।

সীতা বলে, ''আমাদের কি হবে? যদি তারা তোমাকে কোন দূরবর্তী জায়গায় বদলী করে দেয়? মা এবং আমি অসুস্থ। বাবা একা ঘরের সব কাজ সামলাতে পারবেন না।''

তখন বাবা বলেন, ''সীতা, তুমি কি ওকে দুর্নীতিপরায়ণ হতে বলছ? যা ঘটে ঘটুক, খোকা, তুমি এই রকম টাকা নিও না।'' মাও বাবার কথাকে সমর্থন করেন।

সীতা উত্তর দেয় ''বাবা, আমি কখনোই চাই না আমার স্বামী দুর্নীতিপরায়ণ হোন। আমি অবশ্যম্ভাবী ফল তাকে মনে করিয়ে দিয়েছি মাত্র।''

বাবা বলেন, ''বউমা আমরা কোন না কোন ভাবে সামলে নেব। ঈশ্বর আমাদের

সংগে আছেন"।

যে ভয় এবং প্রত্যাশা ছিল সেটাই ঘটল। এক সপ্তাহ পরেই কৃষ্ণান বদলীর অর্ডার পেল।

তাকে দূরের এক গ্রামের প্রান্ত সীমায় বদলী করা হল। কৃষ্ণান ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গ্রামের অফিসে কাজে যোগ দিয়ে সে হাইকোর্টে অভিযোগ জানাবে বলে মন স্থির করে। সে তার পরিবারে মা, বাবা এবং স্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন পায়। সে অফিসের কাছাকাছি এক বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকছিল। প্রবল ঠাণ্ডাতেও কৃষ্ণান অফিসে সেই অঞ্চলের গরীব মানুষদের স্বার্থে তার কাজ করে যাচ্ছিল। তাদের সার্টিফিকেট এবং অন্য সব তথ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়া হচ্ছিল। সে অফিসে সন্ধে পর্যন্ত থেকে যেত এবং সব কাজ দ্রুত করে দিত। সৌভাগ্যবশত গ্রামের ট্যাক্স অফিসারটি সৎ, কাজের প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

কৃষ্ণান কোর্টে তালুক অফিসের তহসিলদার এবং সব কর্মীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের মামলা করে। এক সময় ছাত্র হিসেবে সে যুক্তি দিত যদি কখনো সুযোগ আসে সে উৎকোচ গ্রহণের বিপক্ষে লড়বে। উকিলের পারিশ্রমিক মেটানোর জন্য সে সীতার সোনাদানা বন্ধক রাখে। মুখ বন্ধ খাম সে প্রত্যাখ্যান করেছিল আগেই। সেইসময়কার পিওন, তহসিলদার, আধিকারিক এবং অন্যান্য কেরাণীদের সংগে তার কথোপকথন মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে রেখেছিল। সে প্রমাণ হিসেবে সেই সব রেকর্ডিং উকিলকে দেখায়।

এক মাস পর শুনানির দিন আসে তার নিজের পক্ষের এবং বিপক্ষের উকিল এবং শেষে বিচারক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তালুক অফিসের সব কর্মী, এমনকি কিছু ক্রেতা যারা তাদের উৎকোচ দিয়েছিল তাদেরও কৃষ্ণানের উকিল জেরা করেন। উৎকোচ গ্রহণের পরিষ্কার তথ্য প্রমাণ ছিল। ওই অফিসের সব কর্মী উপভোক্তাদের থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে আসছিল। বিচারক রায় ঘোষণা করেন। তিনি সরকারকে বলেন যে তালুক অফিসের সব কর্মীকে প্রত্যন্ত গ্রামে বদলী করে দেওয়া হোক্ এবং তাদের দুটো ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধি কেটে নেওয়া হোক্। এর সংগে পদ অনুযায়ী তারা ৫০,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা ফাইন দেবে এবং ওই ফাইনের সংগৃহীত অর্থ থেকে কৃষ্ণানকে ২,০০০০০ টাকা পুরস্কার হিসেবে দিতে হবে। নির্ভীক হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এটা তার প্রাপ্য। আরও কথা হল কৃষ্ণানকে তার নিজের শহরে স্থানান্তরিত করা উচিত আরও দুটো অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দিয়ে বেতন দেওয়া উচিত।

রায়ের এই খবর সব খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এবং টেলিভিশনের সব চ্যানেলে তাজা খবর হিসেবে দেখানো হয় এবং কৃষ্ণান সকলের প্রশংসা পায়। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেই মঞ্চে তাকে আদর্শ সরকারী কর্মচারীর খেতাব দেওয়া হয়।

সেনথিল কুমারের কাছ থেকে একটি ইমেল
An Email from Senthil Kumar

প্রিয় অধ্যাপক ডমিনিক,

আমার উত্তর দিতে দেরী হওয়ার জন্য আমি ভীষণ দুঃখিত। যখন আমি আমার ইনবক্স খুলে আপনার তিনটি মেল দেখি তাতে আমার নীরবতায় আপনার মনের ক্ষোভ এমনকি আপনার ক্রোধ উপলব্ধি করতে পারছি। আমি নিশ্চিত যে আপনি যখন এই মেলটা পড়বেন আপনার সব রাগ গলে জল হয়ে যাবে এবং তা সহানুভূতিতে পরিবর্তিত হবে।

আপনি জানেন যে আমার মা বেশ কয়েক বছর ধরে আমার কাছে থাকছেন। ১৯৯০ সাল থেকে হৃদযন্ত্রে সমস্যার কারণে তার চিকিৎসা চলছে। আমার স্ত্রী এবং আমি যখন অফিস যাই বাড়িতে তিনি গৃহরক্ষীর মত একলা থাকেন। যদিও তিনি এখন আশি বছরের তিনি নিজের কাজ নিজেই করেন। নিজের খাবার এবং ওষুধ নিজে ঠিক সময়ে খেয়ে নেন। সুতরাং আমাদের অনুপস্থিতিতেও ৯-৩০ থেকে ৫-৩০ পর্যন্ত সব কিছু সুচারু ভাবেই চলছিল। আমি একজন কাজের লোক রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার স্ত্রী এর বিপক্ষে ছিলেন। যেহেতু বাইরের লোক আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হরণ করবে। এবং আমার মাও বলেছিলেন যে তিনি কাজের লোক বা সেবিকা ছাড়া নিজেকে সামলাতে পারবেন।

আমার মা স্বভাবে অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ এবং বয়স বাড়ার সংগে সংগে অনুভুতি প্রবণতাটা বেড়ে গেছে। খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিদিনকার কোন দুঃখজনক ঘটনা বা কারো অকাল মৃত্যু তার মনকে এমন ভাবে আন্দোলিত করে যে তিনি কাঁদতে শুরু করেন, গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামে। ডাক্তার আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে তার হৃদযন্ত্র কোন মানসিক চাপ বা দুঃখ সহ্য করতে পারবে না। আমাদের দেখা উচিত যাতে সব সময় তিনি খুশী মনে থাকেন। সুতরাং আমরা

তামিল খবরের কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি এবং শুধু হিন্দু কাগজটি নেওয়া হত। আমি, আমার ভাই এবং বোনেরা ঠিক করেছিলাম যে যখন আমরা মায়ের কাছে যাব কোন দুঃখজনক এবং অপ্রীতিকর কিছু মাকে বলব না।

এর মধ্যে আমরা জেনেছিলাম যে মায়ের ছোট বোন হাসপাতালে ভর্তি। তিনি আমাদের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে বাস করতেন। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছেন এবং তার পর থেকে তিনি আর দাঁড়াতে বা চলতে পারছেন না। আমরা হাসপাতালে যাই আমার মাকে এই বলে যে আমরা এক বিয়ের অনুষ্ঠানে খেতে যাচ্ছি। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে ঈশ্বর এই মিথ্যা বলার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন। আমরা যখন হাসপাতালে পৌঁছাই আমরা দেখি আমাদের মাসীমা আই সি ইউতে (ICU) এবং ডাক্তার বলেছেন যে তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়েছেন।

সন্ধ্যে বেলা আমরা বাড়ি ফিরি। মা জানতে চেয়েছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানে ডিনার কেমন হল, বউ কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের একটার পর একটা মিথ্যার ঝুরি বানাতে হয়। মাসীমাকে হাসপাতাল থেকে দু সপ্তাহ পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যেহেতু ডাক্তারদের আর কিছু করার ছিল না। তিনি এখনো শয্যাশায়ী এবং এবং দুবছর বিছানাতেই - কথা বলতে পারেন না, কিছু মনে করতে পারেন না এবং চামচে খাবার খান। অবশ্যই আমার মা এখানে আছেন, তার বোনের দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুই জানেন না। মাঝে মাঝে তিনি মাসীমার খবর জিজ্ঞাসা করেন এবং আমাদের বলেন তাকে ফোন করতে। আমরা তাকে বলতাম যে মাসীমা তার বাড়িতে খুব ভাল আছেন। আমাদের মাসতুতো ভাই বোনেদের বলে রেখেছিলাম যে আমরা এই রকম অনিবার্য্য মিথ্যা আমাদের মাকে বলেছি এবং যখন তারা দেখতে আসবে তারা যেন সত্যটা না বলে।

কোন একদিন যখন আমার এক ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং তার পা ভেঙে যায় আমি মাকে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে ছোটখাট বাইক অ্যাক্সিডেন্টে ভাইয়ের সামান্য আঘাত লেগেছে। একথা শুনে হঠাৎ করে মা ফোপাঁতে শুরু করেন এবং তার হৃদস্পন্দন ধীরগতি হয়ে পড়ে। যেহেতু শ্বাস প্রশ্বাস খুবই ধীর এবং কষ্টকর হয়েছিল অবিলম্বে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওষুধ ইনজেকশন এবং পরিপূরক অক্সিজেন পেয়ে তিনি এক সপ্তাহে সেরে ওঠেন। ডাক্তার আমাদের সাবধান করে দেন যে এই রকম দুঃখজনক খবর তাকে না দিতে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তার স্মৃতি শক্তি প্রায় নেই সেই থেকেই। সেটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি আমার ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্ট এবং তার আঘাত

ভুলে গিয়েছেন। তিনি প্রায়ই আমাকে সেই ভাইয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন কেন সে তাকে দেখতে আসে না। আমি বলতাম যে সে তার শহরে কাপড়ের ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত। সে সুস্থ হওয়ার পর যথারীতি মাকে দেখতে আসত এবং মা'ও তাকে পেয়ে খুশী হতেন।

তারপর একদিন আমাদের মামার বাড়ি থেকে ফোন পাই - মায়ের সব চেয়ে ছোট ভাই - আমাদের বাড়ি থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে বাড়ি, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অবস্থা সংকটজনক। মাকে আর একটা মিথ্যা কথা বলে আমরা তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যাই। মামার অবস্থা খুব খারাপ এবং দ্রুত অবনতির দিকে। ডাক্তার বলেন যে পুনরুদ্ধার অসম্ভব। মামার ফুসফুসে গভীর ক্ষত এবং কয়েক দিনের মধ্যে জীবনাবসান ঘটবে।

আমরা আবার উভয় সংকটে পড়ে গেলাম। এই মামা ছিলেন মায়ের ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। যেহেতু আমাদের মায়ের বাবা এবং মা অল্পবয়সে মারা গিয়েছিলেন আমার মা'ই তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন। আসলে তিনিই তার মা ছিলেন। যখনই এই মামা আমাদের বাড়ি আসতেন তাদের দুজনের ভালবাসা আমাদের প্রায় ঈর্ষান্বিত করত। এখন সেই লোক মৃত্যু শয্যায় আমরা কি করব? তিনি বৃদ্ধ নন বয়স মাত্র ৬৫। মা'কে যদি খবরটা দেওয়া হয় তাহলে কি হতে পারে? আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মাকে মামার সংকটপূর্ণ অবস্থা জানাব না। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা কোন কাজে আসে নি এবং এক সপ্তাহ পর মামা হাসপাতালে মারা যান। টেলিফোনে তার মৃত্যুর খবর আমরা পাই।

আমরা আবার এক উভয় সংকটে পড়ি। আমরা কিভাবে আমাদের মা'কে বলব যে তার আদরের ভাই আর নেই? এই খবরটা নিশ্চিত তার জীবনের অবসান ঘটাবে। মায়ের কাছ থেকে এই মারাত্মক খবরটা লুকিয়ে রাখা কি অপরাধ? আমাদের আত্মীয় স্বজন এবং আর সব লোক কি বলবে যখন তারা জানবে যে আমরা এই খবরটা লুকিয়েছি তার প্রিয় ভাইকে দাহ করার আগে একবার দেখতে দিই নি? ডাক্তারের সাবধান বানী আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে যা অমান্য করা মানেই মায়ের মৃত্যুর ঘন্টা বেজে ওঠা। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আবার অনেকটা সময় ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে মায়ের জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান সেজন্য তার জীবন আমাদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত। আমরা মা'কে মিথ্যা বলে, বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি বলে মৃতদেহ সমাহিত করতে গেলাম। আমরা হতভাগ্য পরিবারকে বলেছিলাম যে মায়ের এতটা দূর আসার মত অবস্থা নেই।

এইভাবে মা শুধু আমাদের আনন্দের কিছু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে ছিলেন। বাস্তবিক, তিনি দিনে তিনবার কড়া কড়া ওষুধ খেয়ে বেঁচেছিলেন। এইভাবে আরেকটা বছর একটু একটু করে কেটে গেল। একদিন অফিসের কাজে ফাইল পত্র নিয়ে আমি যখন ব্যস্ত আমি একটা ফোন পাই।

ভাই সেনথিল, আমি মুথু বলছি তোমার বাড়ি থেকে। তাড়াতাড়ি এসো, কারণ মায়ের অবস্থা খুব সংকটজনক।

''মুথু, আমি আসছি।'' হন্তদন্ত হয়ে আমার গাড়িতে বাড়ি আসি। মা তার বিছানায় শোওয়া, চোখ বন্ধ এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি কেঁদে ফেলি, মা, মা। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নি।

''মুথু, তুমি কখন এখানে এসেছ?'' আমি জিজ্ঞাসা করি।

''আমি মিনিট পনের আগে এসেছি। তোমাদের সবাইকে বাবার মৃত্যু বার্ষিকীতে আমন্ত্রণ জানাতে'' মুথু হল আমার ওই মামার বড় ছেলে যিনি গত বছর মারা গিয়েছিলেন।

''ওহ, তুমি তাহলে তোমার আসার কারণ মা'কে বলেছিলে। আমরা মাকে তোমার বাবার মৃত্যুর খবরটা দিই নি কারণ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে এই আশঙ্কায়'' আমি বলি।

''আমি ত সেটা জানতাম না, ভাই। খুবই দুঃখিত'' সে ক্ষমা চায়।

''চলো মা'কে হাসপাতালে নিয়ে যাই,'' আমি বলি। তৎক্ষণাৎ আমরা সেই ব্যবস্থা করি। ডাক্তার তাকে ইনজেকশন এবং অক্সিজেন দেন। রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত নেওয়া হয়। আমি আমার স্ত্রী, ভাই এবং বোনদের ফোনে জানাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা হাসপাতালে আসে। মা'কে আই সি ইউ তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমাদের তাকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয় নি। দু ঘণ্টা পর ডাক্তার আমাদের জানান যে তার গুরুতর স্ট্রোক হয়েছে। ভাল হওয়ার আশা নেই বললেই চলে। তার জীবন টিকে থাকলেও তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে থাকবেন। তার ছোট বোনের মত তিনিও শয্যাশায়ী। গতকাল মা'কে হাসপাতাল ছেড়ে দিয়েছে এবং আমার বাড়িতে শুয়ে তার মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আশা করি আপনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। আপনি আমার অশান্ত মনকে কোন ভাবেই শান্ত করতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে আমার মায়ের জন্য প্রার্থনা করুন।

ভালবাসা
সেনথিল কুমার

সঞ্চিত কর্ম

Sachita Karma

''তোমরা আমাদের প্রতি কেন এত নিষ্ঠুর, এই রকম এতক্ষণ সময় ধরে তাড়া করো কিন্তু আমাদের ধরো না?'' পুরুষ ইঁদুরটি ছোট বড় মিলিয়ে সাতটি বিড়ালের দলকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

''তোমাকে আমরা এর কারণটা বলব। আমরা সাতটি বিড়ালের আত্মা যাদের পূর্ব জন্মে তুমি বিষ খাইয়ে মেরেছিলে। তুমি কি জান আগের জন্মে তুমি কে ছিলে? তুমি ছিলে অ্যাডভোকেট স্টিফেন তোমার এই বউ ছিল গৃহবধূ স্টেলা। আমি প্রিথী ছিলাম এই সব সন্তানদের দিদিমা এবং এই দুজন হল প্রথম দুই মেয়ে মনিকুট্টী এবং আম্মিনি। অন্যরা তাদের বাচ্চা কিংগানন, রোডি, কিট্টু এবং কিট্টি। আমাদের বলো কেন আমাদের হত্যা করেছিলে? আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করেছিলাম?'' প্রিথী প্রচণ্ড ক্রোধে বলে।

''আমাদের বিশ্বাস হয় না এর আগে আমাদের জন্ম হয়েছিল'', পুরুষ ইঁদুরটি বলে।

''এমনকি যদি একটা জন্ম থাকেও আমরা একজনকেও হত্যা করিনি'', নারী ইঁদুরটি সংযোজন করে।

''তোমাদের নিয়ে এটাই সমস্যা। তোমাদের ধর্ম তাহলে তোমাদের পুনর্জন্মের বিষয়ে কিছু শেখায় নি। তোমরা বিশ্বাস করতে যে মৃত্যুর পর তোমাদের আত্মা হয় স্বর্গে বা নরকে যাবে। তোমরা অন্তঃসার শূন্য এক দর্শনে বিশ্বাস করতে যে মানুষ হল পৃথিবীর কেন্দ্রে এবং আর সব প্রাণী তোমাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তোমরা বিশ্বাস করেছিলে যে ঈশ্বরের প্রতিরূপে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমরা তাঁর (ঈশ্বরের) প্রিয়। তোমরা কখনো তোমাদের অতীত নিয়ে ভাবো নি যেহেতু তোমরা

তোমাদের দেবত্ব হারিয়ে ফেলেছ তোমাদের অপবিত্র অপরাধমূলক কাজের দ্বারা,” প্রিথী দৃঢ় স্বরে জানায়।

‘‘আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে আমাদের বলো অতীতে আমরা কি করেছিলাম”, পুরুষ ইঁদুরটি বলে।

‘‘আমি তোমাকে তোমাদের অতীতে নিয়ে যাব। আমি আগেই বলেছি, তুমি তখন ছিলে অ্যাডভোকেট স্টিফেন। বিশাল প্রাঙ্গণ বিশিষ্ট প্রাসাদোপম বাড়িতে তুমি তোমার স্ত্রী স্টেলাকে নিয়ে বাস করতে। তোমাদের দুটো মেয়ে ছিল যারা তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিলে এবং তারা মেট্রো শহরে বাস করত। তোমাদের গৃহপালিত কোন পশু ছিল না এমনকি কুকুর বিড়ালও না। তোমাদের এক প্রতিবেশী ছিল। তার নাম ছিল কৃষ্ণান। তিনি কৃষি বিভাগের একজন অফিসার ছিলেন। তিনি তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকতেন। তার স্ত্রী চাকরী করতেন এবং তাদের দুটি ছেলে মেয়ে ছিল। হিন্দু হওয়ায় কৃষ্ণানের পরিবারের সংস্কৃতি তোমাদের থেকে আলাদা ছিল। তারা ছিলেন নিরামিষাশী এবং অদ্বৈত দর্শনে বিশ্বাসী। তারা ছিলেন আমাদের মালিক। নিজের সন্তানের মতই তারা আমাদের ভালবাসতেন। আমরা তিন প্রজন্ম পাঁচ বছর তাদের সংগে বসবাস করতাম”, প্রিথী মিনিট খানেক থামে।

‘‘তারপর কি হয়েছিল?” স্ত্রী ইঁদুরটি জিজ্ঞাসা করে।

‘‘কৃষ্ণান কবিও ছিলেন। তার কবি মন তাকে এবং তার পরিবারকে এক বিশেষ ছাঁচে তৈরী করেছিল। তারা হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃতি প্রেমী। তার ১/১০ একর জমি ছিল এবং সেখানে তিনি পেঁপে গাছ বসিয়ে ছিলেন, নিজের জন্য বা তার পরিবারের জন্য নয় কাক, ময়না, কোকিলদের মত পাখীদের জন্য যাতে তারা পাকা ফল খেতে পারে। প্রতিদিন তিনি কাকদের ভাত খেতে দিতেন, এবং পাখীদের খাওয়ার জন্য একটা গামলায় জল ভর্তি করে রাখতেন।

আমাদের বিড়ালদের জন্য প্রাতভ্রমণ সেরে ফেরার পথে প্রতিদিন শ্যামন মাছ আনতেন। এইভাবে আমাদের ভাত এবং টাটকা মাছ রোজ খাওয়াতেন। তারা আমাদের কখনও এক ঘণ্টাও অভুক্ত রাখতেন না। আমরা অট্টী বংশের অন্তর্গত। আমাদের লোমশ লেজ এবং গা ভর্তি বরফের মত সাদা পশম লোম। তারা আমাদের দেবদূতের মত মনে করতেন এবং আর সব কিছুর মত আমাদের ভালবাসতেন। কৃষ্ণান আমাদের জন্য একটা প্ল্যাস্টিক বল কেনেন এবং আমরা সেই ফুটবল নিয়ে তার বসার এবং খাওয়ার ঘরে খেলতাম। সেই সুখ অবর্ণনীয়। কৃষ্ণানের পরিবার

আমাদের উপস্থিতিতে সেই সুখ উপভোগ করতেন। আমরা তার কোলে বসতাম তার আলতো হাতে চুলকে দেবার আশায়। এই আরাম আমরা প্রচুর পেয়েছি। প্রায়ই আমরা তাদের পছন্দের সোফা এবং লম্বা সোফায় ঘুমিয়ে থাকতাম। তাদের অতিথিরা এলে অন্য জায়গায় বসতেন আমরা যখন সোফা দখল করে রাখতাম। প্রিথী থামে।

''তাহলে কেন স্টিফেন তোমাদের হত্যা করে ছিল?'' পুরুষ ইঁদুরটি জিজ্ঞাসা করে।

''তোমাদের ইঁদুরদের মত আমাদের বিড়ালদের ও কোন সীমারেখা নেই। সৃষ্টি কর্তা উদ্ভিদ এবং পশুদের জন্য এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি (ঈশ্বর) মানুষকে কোন জমিতে বেড়া দেওয়ার বিশেষ কোন অধিকার দেন নি। কিন্তু স্বার্থপর মানুষেরা তাই করে। আমাদের সর্বজনীন স্বর্গীয় প্রবৃত্তি আমাদের প্রলুব্ধ করে মানুষের দেওয়া প্রাচীর গুলো পেরিয়ে যেতে বা লাফ দিতে। এইভাবে আমরা স্বাধীনতা পিয়াসী হতে চাই। আমরা স্টিফেনের বিশাল এলাকায় দৌড়তে এবং খেলা করতে যেতাম। সেই জায়গাটা আমাদের মুগ্ধ করেছিল - সেখানে প্রজাপতি, পাখী, কাঠ বিড়ালী, ফড়িং এবং আর ও কত কি ছিল। দিনের বেশীর ভাগ সময় আমরা সেখানে খেলা করতে পছন্দ করতাম, একজন অন্য জনের পিছনে দৌড়তাম। স্টিফেন এবং তার স্ত্রী সেখানে আমাদের উপস্থিতি পছন্দ করতেন না। তাদের নিজস্ব সম্পত্তি সম্পর্কে সূক্ষ্ম অহংবোধ তাদের সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশকারী আমাদের সহ্য করতে পারে নি। তদুপরি আমরা সেই এলাকা নোংরা করতাম কিন্তু পরিত্যক্ত মল মাটি চাপা দিয়ে দিতাম,'' শ্বাস নেওয়ার জন্য প্রিথী থামে।

''তারপর তোমরা তার বাড়িতেও সম্ভবত ঢুকেছিলে, যা স্টিফেনকে ক্রুদ্ধ করেছিল', স্ত্রী ইঁদুরটা মন্তব্য করে।

''না, আমরা কখনো তা করি নি। আমরা কখনো খাবার দাবার চাই নি যেহেতু আমাদের প্রভুরা খুব ভাল খাবার দিতেন। স্টিফেন আমাদের তার বাড়ি যাওয়া পছন্দ করতেন না তার প্রাঙ্গণে মল ত্যাগ করে আসার জন্য। প্যারাডক্স হল তিনি এবং তার স্ত্রী প্রতিদিন চার্চে যেতেন। সেখানে যীশুর বাণী শুনতেন যে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে এমনকি তোমার শত্রুকেও ভালবাসবে। প্রতিবেশীকে ভালবাসার মানে প্রতিবেশীর যা কিছু সম্পদ এবং সম্পত্তি আছে তাকেও ভালবাসবে। স্টিফেন খুব ভাল করেই জানতেন যে কৃষ্ণান এবং তার পরিবার তাদের বিড়ালকে নিজেদের সন্তানের মত ভালবাসেন।

কিন্তু তার এবং তার স্ত্রীর ভেতরকার শয়তান আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত এবং এটা বিষ প্রয়োগে চরম রূপ পায়। খুব সকালে চার্চে যাওয়ার আগে মাছ ভাজায় কিছু ইঁদুর মারার বিষ মিশিয়ে আমার প্রভুর আঙিনার কাছাকাছি রেখে যায়। কোন্ বিড়ালের মাছে অরুচি? খুব সকালে যখন আমরা প্রভুর বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলাম আমরা প্রলুব্ধকর মাছের গন্ধ পাই এবং একটা একটা করে তা খাই। তিন বারের চেষ্টায় আমরা সবাই খুন হয়েছি। আমার মনিকুট্টী আর আম্মিনি প্রথম বলি। আমাদের প্রভুরা তখন কত চোখের জল ফেলে ছিল! তারা স্টিফেনকে অনুযোগ করেন নি কারণ সে অস্বীকার করত এবং তাদের অপমান করত। কয়েক মাস পরে কিংগানন, রোডি, কিট্টু এবং আমি নিজে বলি হই। আমাদের প্রভু পত্নী স্টিফেনের বাড়ি যান এবং তখন অশ্রুপূর্ণ চোখে অভিযোগ জানান। কিন্তু তারা অভিযোগ অস্বীকার করে না জানার ভান করেছিলেন। কতখানি মর্মাহত হয়ে এবং কাঁপা হাতে তিনি (আমাদের প্রভু) আমাদের জন্য কবর খুঁড়ে ছিলেন ! বিষের জ্বালায় আমাদের প্রভুর রান্না ঘরে জলের জন্য দৌড়তে হয়েছিল কিন্তু আমরা জল খেতে পারি নি।

খুব মর্মাহত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার প্রভু এবং প্রভু পত্নী আমাদের মুখে নলের মাধ্যমে জল দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু আমরা জল খেতে পারি নি, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অনেক ক্ষণ জল খেতে পারিনি। তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে আমাদের প্রভুকে চির বিদায় জানিয়ে ছিলাম।

কয়েক মাস পরে মাত্র তিন মাসের বাচ্চা কিট্টিকে একই ভাবে বিষ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের প্রভুর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি ঠিক করেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি আর বাড়িতে বিড়াল পুষবেন না। এখন তুমি হলে সেই স্টিফেন এবং তুমি হলে তার স্ত্রী। যে নিষ্ঠুর আচরণ তোমরা আমাদের এবং প্রভুদের ওপর করেছ তা হল এক রাশ দুস্কর্ম। তার ফল তো থাকবেই। তোমাদের অপরাধের ভার এতই যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করে শাস্তি লাঘব করা যেত না তোমরা যখন মানুষ হয়ে বেঁচে ছিলে। সুতরাং গত জন্মে কৃত তোমাদের অদৃষ্টের চাপে ইঁদুর হয়ে জন্মাতে হয়েছে। সাতটা বিড়ালের আত্মা দ্বারা তাড়িত হওয়ার জন্য তোমরা প্রেরিত হয়েছ,'' প্রিথী চাপা ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটালো।

''আমরা আর বাঁচতে চাই না। আমরা মোক্ষ চাই।''

''অনুগ্রহ করে আমাদের হত্যা করো যেমন ভাবে আমরা তোমাদের হত্যা করে ছিলাম,'' দুটো ইঁদুরই অনুনয় করল।

''আমরা কখনো সেই রকম কিছু করতে চাই নি, কিন্তু পরম প্রভু আমাদের তোমাদের প্রাণ নেবার জন্য আদেশ করেছেন। এটা সঞ্চিত কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। এখন আমার সন্তানরা তোমাদের বধ করবে'' প্রিথী আদেশ করে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ইঁদুর বধ হল এবং উদরস্থ হল।

* হিন্দু শাস্ত্রে সঞ্চিত কর্ম হল মানুষের দ্বারা কৃত তিন প্রকার কর্মের মধ্যে অন্যতম কর্ম। অন্য দুটি (কর্ম) হলঃ ক্রিয়মাণ কর্ম এবং প্রারব্ধ কর্ম। তোমার পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত সব কাজের একত্রিত ফল হল সঞ্চিত কর্ম। এটা হল তোমার সামগ্রিক জাগতিক ঋণ। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হয় তুমি এতে কিছু যোগ করে চলেছ বা ঋণ হ্রাস করে চলেছ। তোমার দ্বারা কৃত সেই সব কাজ তৎক্ষণাৎ বা সেই মুহূর্তে ফল দেয় না। পরিপক্ক হয়ে ফল দিতে কিছু সময় নেয়। এই কর্ম গুলো স্থগিত থাকে পরিপক্ক হয়ে সময়ের সুযোগ খোঁজে ভবিষ্যতে ফল দেওয়ার জন্য। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সাম্যাবস্থায় থাকে এবং পুঞ্জীভূত হয়। ফল না দেওয়া পর্যন্ত এইসব সঞ্চিত কর্ম প্রশমিত হয় না।

মোক্ষ হল সংসার বা জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি।

যমজেরা
The Twins

''কেন তুমি এই বিড়ালটাকে রান্না ঘরে ঢুকতে দাও? তুমি সেখানে না থাকলে এটা আমাদের খাবারে মুখ দেবে,'' আমি আমার স্ত্রীকে বললাম। তিনি সকাল বেলায় রান্না ঘরে যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় ব্যস্ত থাকেন।

''তুমি ওপর তলায় তোমার কমপিউটার নিয়ে ব্যস্ত থাক। আমার একাকীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য আমার সংগে আর কে আছে? সেজন্য আমি সুন্দরীকে রান্না ঘরে ঢুকতে দিয়েছি,'' আমার স্ত্রী উত্তর দেয়।

আমার স্ত্রী বাইরের এই বেওয়াড়িশ বিড়ালটার নাম দিয়েছেন সুন্দরী। আমাদের ঠিক পাশের প্রতিবেশী যখন অন্যত্র চলে যান বিড়ালটিকে ফেলে চলে যান। সুন্দরী সেই রকম আহামরি সুশ্রী নয়। সে গোলাপি এবং সাদা রঙের সাধারণ জাতের দেশজ প্রজাতির বিড়াল। বাইরের বিড়াল হওয়াতে সে ভয় পেত যখন আমি বা আমার ছেলে ওর কাছে যেতাম। আমাদের কেউই তাকে ছুঁতে পারতাম না। আমাদের স্পর্শ এবং বিড়ালটির ক্রন্দন আমার স্ত্রীর একাকীত্ব কাটিয়ে দিত।

আমি নিজেকে কিছুটা অপরাধী মনে করতাম স্ত্রীকে এতটা সময় একা রান্না ঘরে থাকতে হয় বলে। সে নারীবাদী নয়। সে কখনো জোর করে নি যে আমার তাকে রান্নার কাজে সাহায্য করা উচিত। আমরা পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের অন্তর্গত এবং এইরকম পরিবারে মহিলাদের ওপর পুরুষের প্রাধান্য থাকে। সুতরাং আমার স্ত্রী কখনো দাবী করেন নি যে বন্ধুদের ইমেল করার পরিবর্তে আমায় তাকে সাহায্য করতে হবে। আমাদের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হবে এই আশঙ্কায় তিনি পরিচারিকার সাহায্যও চাইতেন না। আমি যখন ছাত্রদের নারীবাদ পড়াই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ছেলেরা যেন আমার জীবনে এই তত্ত্বের প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা থেকে নিরস্ত থাকে। একজন শিক্ষকের ছাত্রদের কাছে আদর্শ হওয়া উচিত।

সুন্দরীর সংগে আমার স্ত্রীর সখ্যতা বজায় ছিল এবং বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। তবু সে বিড়ালটিকে হাত বোলাতে পারে নি। সুন্দরী গর্ভবতী হয় এবং এক দুমাস পরে দুটো বিড়াল ছানার জন্ম দেয়। দুটোই একদম মায়ের মত দেখতে। জন্মের এক সপ্তাহ পরে তাদের রান্না ঘরে আনা হয়। এখন একটার জায়গায় আমার স্ত্রীর সঙ্গী হল তিনটি। তার রান্না ঘরের কাজ অনেক শান্তিদায়ক এবং আনন্দদায়ক হয়। আমিও উপভোগ করি তাদের খেলা। এর পর দেখা গেল একটা বাচ্চাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার কি হয়েছিল এখনও অজানা। যেহেতু বিড়ালদের নিয়ে সে খুব খুশী ছিল আমি ঠিক করে ছিলাম বিদেশী প্রজাতির একটা সুন্দর বিড়াল ছানা কিনে আনব। যাকে আমরা কোলে রেখে হাত বুলিয়ে দিতে পারব এবং তার সংগে আমাদের ভাববিনিময় হবে। আমি যখন এই ইচ্ছা প্রকাশ করি আমার এক সহকর্মী বলেন যে তিনি আমাকে একটার পরিবর্তে যমজ বাচ্চা দেবেন। সেই অনুযায়ী আমি তার বাড়ি গিয়েছিলাম এবং তিনি একটা বাক্সে করে যমজ দুটি বিড়াল উপহার দেন। আমাদের একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বাক্সটা খোলা হল। আমার স্ত্রী এবং আমার ছেলে অতিথিদের দেখার জন্য উদগ্রীব ছিল। বাক্স থেকে দুটো দেবদূত বেরিয়ে এল। বাস্তবিক, সেই দুটো ছিল খুব খুব সুন্দর। মাথায় এবং লেজে ঘন কাল দাগ ছাড়া তাদের ছিল বরফের মত সাদা লোম। তাদের লেজ গুলো ছিল মোটা এবং ঘন লোম যুক্ত। ওটি বিড়ালের এটাই হল বিশেষত্ব। মাথায় এক জোড়া রত্ন নিয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। যমজ দুটো একটুও ভয় পায় নি। আমার স্ত্রী তাদের সামনে একটু দুধ রাখে এবং তারা একটু খায়। এরপর তারা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। তারা ছিল দেখতে হুবহু একই রকমের (identical twins) একজনের কাল দাগ থেকে অন্য জনের কাল দাগ ছিল বেশী ঘন। আমার স্ত্রী তাদের নামকরণ করলেন মণিকুট্টি এবং আম্মিনিকুট্টি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই দুটো যমজ আমাদের নিস্পাপ শৈশবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে খেলায় আমরা বাচ্চাদের মত আচরণ করতে শুরু করি। তখন সুন্দরী এবং তার বাচ্চারা উপেক্ষিত হয়। আসলে তারা রান্না ঘরে আসা পরিত্যাগ করেছিল এবং যমজেরা সেই জায়গা দখল করে। যমজদের জন্য একটা প্লাস্টিক বল আনা হয়েছিল। তারা যেভাবে ফুটবল খেলত বিশ্বকাপ দেখার চাইতেও তা উত্তেজক ছিল। স্বাভাবিক ভাবে এই বিড়ালদের তৎপরতা বিশ্বকাপের নায়কদের বা হিরোদের চাইতে আকর্ষণীয় ছিল।

আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যমজেরা আমাদের ওপর চাপ এবং নিষেধাজ্ঞাও চাপিয়ে দেয়। প্রথম তিন দিন তারা আমাদের শোবার ঘরে বিশেষত বিছানা এবং বালিশকে

তাদের টয়লেট হিসেবে ব্যবহার করে। আমাদের তাদের মল পরিষ্কার করতে হয়, বালিশ এমন কি পুরো বিছানাই পালটাতে হয়। সাবধান হয়ে শোবার ঘর এবং পড়ার ঘর সবসময় বন্ধ রাখতে হয়। সুন্দর সোফার ঢাকনা টেনে আঁচড়ে তাতে তৎক্ষণাৎ হিসি করে দিত। সোফা সেই কারণে ঢাকনা বিহীন হয় এবং এটা তাদের নখে ধার দেওয়ার জায়গা হয়ে দাঁড়ায়।

তবু এই সব সমস্যা এবং অসুবিধে গুলোর একটা মাধুর্য ছিল যদিও অসহনীয় মাধুর্য ! ধীরে ধীরে ঘরের পরিবর্তে যমজেরা বাথরুমকে তাদের বর্জ্য পরিত্যাগের জায়গা করতে শুরু করে। আমার দায়িত্ব ছিল তাদের মল ফেলা এবং বাথরুম জীবাণু মুক্ত করা। দিনে তিনবার এটা করতে হত। যমজেরা যখন খেলত না আমাদের কোলে বসতে চাইত। এক লাফে কোলে উঠে আমরা যখন পড়ছি বা লিখছি তারা উরুদেশে ছোট নখে আঁচড়ে দিত। একদিন যখন আমার পা থেকে রক্ত ঝরেছিল চিন্তিত হয়েছিলাম। আমি পড়েছিলাম যে বিড়ালের নখের আঁচড় থেকে জলাতঙ্ক হয়। যেহেতু যমজেরা জলাতঙ্ক দুষ্ট নয় আমি জলাতঙ্ক নাশক ইনজেকশন নিই নি।

আম্মিনিকুট্টির চাইতে মণিকুট্টি চাইত আমাদের বেশী বেশী গায়ে হাত বোলানো এবং আদর। আদরে তৃপ্ত না হলে সে কাঁধে এবং এমন কি মাথায় উঠে যেত। যদিও তারা জল এবং সাবান দিয়ে স্নান করত না যেমন আমরা দিনে দুবার করে থাকি তাদের দেহ কত পরিষ্কার! কিন্তু কতবার তারা তাদের লালা দিয়ে স্নান করে? প্রকৃতি থেকে আমাদের কত কিছু শেখার আছে। তাদের নখ এবং থাবা আমাকে যন্ত্রণা দিত এবং সেই কারণে আমাকে আমার বুক এবং স্তনবৃন্তকে বাঁচানোর জন্য শার্ট পরতে হয়।

মনে করুন আমি যখন বিড়াল ছানাদের এনেছিলাম তাদের মা দুধ খাওয়াত। তাদের আসার তৃতীয় দিনে যখন আমি সকালে খবরের কাগজ পড়ছি যমজেরা লাফ দিয়ে আমার কোলে চড়ে কাঁদতে শুরু করে। আমি তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিই কিন্তু তা তাদের শান্ত করতে পারে না। ''কেন ওরা কাঁদছে? এই মাত্র ওদের খেতে দেওয়া হল। বাথরুমে গিয়েছিল কি? হ্যাঁ, সেটাও হয়ে গেছে। তাহলে কি হল?'' আমি ভাবতে থাকি।

ঈশ্বর কেন মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীকে কথা বলার ক্ষমতা দেন নি? একদিকে ভাল যে তাদের সেই ক্ষমতা নেই। শব্দ দিয়ে যে শব্দ দূষণ মানুষ তৈরি করে পরমাণু বিকিরণের চাইতেও তা ভয়ংকর! যে নোংরা এবং কুৎসিত শব্দ গুলো তাদের মুখ থেকে বেরোয় তা লক্ষ লক্ষ জীবকে নাশ করতে পারে। বস্তুত ঈশ্বরের নিজের জন্য এটা আত্মঘাতী হয়েছে! মানুষ ঐকতানে বেসুরো স্বর বাজায় যে ঐকতান এই বিশ্বে

অন্য সব প্রাণীরা তৈরী করে। ''মিঁয়াউ, মিঁয়াউ, মিঁয়াউ, মিঁয়াউ'', যমজেরা আমাকে উত্যক্ত করে। ''তোমাদের কি চাই? কিসের জন্য কাঁদছ?'' আমি জিজ্ঞাসা করি। ''মা, মা, মা, মা,'' বলার কায়দা ছিল অন্যরকম। ''ওহ! ওরা তাদের মাকে চাইছে।'' আমি তাদের ভাষা পড়েছিলাম। সম্ভবত তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাদের মা কোথায়।

আমার বুকে শেল বিঁধল। আমি তাদের মায়ের সঙ্গে বন্ধনের আকুতিটা ভেবে দেখি নি। আমি তাদের মায়ের যন্ত্রণাটাও বুঝতে পেরেছিলাম। এটা কি আমার নিষ্ঠুরতা নয় ওইটুকু বাচ্চাদের তার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া? এই ভাবনাটা আমাকে বিদ্ধ করল এবং আমার মনটা ক্ষত বিক্ষত হতে থাকল। আমি কি যমজ দুটোকে তাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেব? না, আমার আবেগ প্রবণ হওয়া উচিত নয়। সর্বোপরি, জীবন হল অসংখ্য মিলন বিচ্ছেদের সমাহার ! ঈশ্বর তার সৃষ্টিকে এই যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি দিয়েছেন ! আমি এই রকম দার্শনিক ভাবনার শরণ নিলাম।

অনেক বিষয় আছে যা আমরা মনুষ্যেতর প্রজাতির কাছে শিখতে পারি। (আমাদের মস্তিস্ক এবং বাক্ ছাড়া আমরা কি তাদের চেয়ে উন্নততর?) এই যমজদের প্রেমের প্রকাশ - তাদের পরস্পরের প্রতি চুম্বন, আদর, আবেগে জড়িয়ে ধরা, চেটে দেওয়া, একজন অন্যজনের দেহের ওপর ঘুমানো, একই থালা থেকে খাবার এবং জল খাওয়া, এক সঙ্গে খেলা করা ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আমাদের চোখ এবং মনের আহার হয়। এখানেই ত প্রকৃত সৌন্দর্যের উপস্থিতি! তারা যখন আমার চারপাশে ঘোরা ফেরা করত আমি তাদের থেকে চোখ ফেরাতে পারতাম না। বাস্তবিক, তারা ছিল চিরকালীন সৌন্দর্য্য ! দরজার পর্দায় ঝুলে থাকা, গ্রিলে উঠে যাওয়া, একসঙ্গে টিভির ওপর, খাওয়ার টেবিল বিশেষত খবরের কাগজের ওপর দুটো পাথরের মূর্তির মত বসে থাকা আমাদের মনকে ভরিয়ে দিত।

একদিন, আম্মিনিকুট্টি জানালার ওপর পর্দা ধরে বাবার ছবির নীচে জ্বলন্ত ঝিক্‌মিক্ লাইট অনুসরণ করে নাচানাচি করতে শুরু করে। যদি আমার বাবা ছবিতে বেঁচে থাকতেন তিনি বাচ্চাদের ধরে আদর করতেন। কারণ তিনি যখন বেঁচে ছিলেন বিড়াল ভালবাসতেন। আমাদের শৈশবে আমরা সব সময় ইঁদুর মারার জন্য বিড়াল পুষতাম। বিড়ালেরা আমাদের সঙ্গে ঘুমোত।

যমজেরা বিপদজনক খেলা খেলত। আমার স্ত্রী বাড়ির পিছনে বসানো নরম লংকা গাছের অতি যত্ন করতেন এবং বিড়ালেরা সেই গাছে উঠে যেত। আমার স্ত্রী

ঝাল লংকা ছিঁড়ে আনতেন। গাছটা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। রাগের জায়গায় আমরা আনন্দ অনুভব করি। শৈশবে আমার ছেলে যদি কোন দুষ্টুমি করত আমরা তাকে শাস্তি দিতাম কারণ ঈশ্বর তার যুক্তি প্রয়োগের সক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ তাদের উন্নত মস্তিস্কে যে সব ধরণের অপরাধ এবং অন্যায় করে অন্য পশুরা তা কখনো করে না।

একদিন আমি যখন কলেজের ক্যান্টিনে চা খাচ্ছি আমার একজন সহকর্মী একজন মানুষের দ্বারা কৃত পাঁচটি খুনের ঘটনা পড়েন। সে তার স্ত্রীকে খুন করেছিল এবং দেহ সেপটিক ট্যাঙ্কে লুকিয়ে ফেলে। দু দিন পর নিজের বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করে। ভাইকে খুন করে এবং কোন এক জায়গায় পুঁতে দেয়। তিনদিন পর তিনি বাকী দুই বাচ্চা ছেলে মেয়েকে স্কুল থেকে এনে হত্যা করে এবং দেহ গুলো একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখে।

পৈশাচিক এই কাজের ওপর মন্তব্য করে একজন শিক্ষক বলেছিলেন, ''একজন মানুষ কিভাবে এত নিষ্ঠুর ভাবে পশুর মত আচরণ করতে পারে?''

আমি বরং রাগান্বিত হয়ে বলি, ''প্রিয় বন্ধু, এই রকম বাক্যবন্ধ দিয়ে পশুদের অসম্মান কোরো না। মানুষের এই রকম সব কাজে পশুদের সংগে তুলনা কোরো না।'' কোন পশু কি কারণ ছাড়া অন্যকে আক্রমণ করে? খাদ্যের জন্য ছাড়া পশুরা কি অন্য প্রাণীকে হত্যা করে? তারা কি আমাদের আক্রমণ করে যদি তাদের খেপানো, বিরক্ত বা ভীত না করা হয়? ''পাশবিক'' এই বিশেষ শব্দটি পুনরায় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।'' সেখানে যে সব শিক্ষকেরা ছিলেন তারা সবাই আমার সঙ্গে সহমত হয়ে ছিলেন।

অবশেষে, আমার বাড়িতে সব ঠিকঠাক ভাবে চলছিল। যমজেরা আমার বাড়িকে স্বর্গ বানায়। আমাদের মেয়ে নিউ দিল্লিতে উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করছিল কবে সে বাড়ি আসবে ছয় মাস পরে এবং যমজদের খেলা উপভোগ করবে। সে তাদের জন্য খেলার উপকরণ নিয়ে আসবে বলেছে। যেহেতু তার জন্মদিন এগিয়ে আসছিল আমি তাকে তার জন্মদিনের উপহার হিসেবে এই গল্পটা লিখেছিলাম।

কয়েক দিন পর আমার স্ত্রী আমাকে বলে, 'প্রিয়তম, আমাদের মা কি করবেন আগামী কাল তিনি যখন এখানে থাকতে আসবেন? কিভাবে তিনি যমজদের সামলাবেন যখন আমরা অফিসের দিনে তাকে দশটা থেকে চারটে একলা রেখে যাব?'' আমাদের মায়ের বয়স সাতাশি বছর। তিনি দুর্বল শরীরের এবং হৃদরোগী। তিনি জীবনকে দীর্ঘায়িত করছিলেন অসংখ্য ট্যাবলেট খেয়ে। তিনি কয়েক মাস

আমার ভাইয়ের বাড়িতে থাকছিলেন। তিনি আমাদের সংগে কিছুদিন থাকতে চান। আমি তাকে কিভাবে বলব যে আমাদের বাড়ি এসো না যেহেতু আমাদের দুটো বিড়াল ছানা এসেছে?

আমি আমার স্ত্রীকে বলি, ''চিন্তা কোরো না, প্রিয়া, মা ঠিক মানিয়ে নেবেন। অথবা, আমরা কি ছানা দুটো সেই শিক্ষককে ফেরত দিয়ে দেব যিনি বিড়াল দুটো দিয়েছিলেন?'' যদিও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি কিন্তু আসলে বিড়ালদের ফিরিয়ে দিতে চাই নি।

''এই দেবদূতদের ফিরিয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না'', আমার স্ত্রী উত্তর দেন।

''ঠিক আছে, আমরা কোন না কোন ভাবে সংকট কাটিয়ে উঠতে পারব'', আমি তাকে বলি।

পরদিন মাকে আমাদের বাড়িতে আনা হল। তিনি বিড়াল ছানাদের দেখে খুশী হন। তিনি তাদের খেলার বিভিন্ন ভঙ্গিমা উপভোগ করেন। পরের দিনটা ছিল সোমবার। আমার স্ত্রীকে তার স্কুলে যেতে হয়েছিল এবং আমাকে আমার কলেজে। মায়ের খাবার এবং দুপুরের ওষুধ তার ঘরের টেবিলে রেখে আমি কাজে গিয়েছিলাম। যমজদের আগেই খেতে দেওয়া হয় এবং তারা তখন ঘুমোচ্ছিল। তাদের জন্য অতিরিক্ত খাবার রান্না ঘরে রাখা ছিল। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে যমজেরা যেন মায়ের কোন সমস্যা তৈরি না করে।

একটা নাগাদ আমি লাঞ্চের জন্য বাড়ি এলাম। সামনের দরজাটা খুলেই আমি মায়ের হাঁপানোর শব্দ পেলাম। আমি দ্রুত তার শোবার ঘরে গেলাম। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম যে ওষুধ খেয়েছিলে কি। মৃদু স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, ''বিড়াল ছানারা খাবার এবং ট্যাবলেট গুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলেছে আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম।'' বাস্তবিক, আমি দেখলাম সাদা ট্যাবলেট গুলো সাদা টালি বসানো মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। তিনি নিজে সেগুলো তুলতে পারেন নি। খাবারও মেঝেতে ছড়িয়ে ছিল।

সেই মুহূর্তে আমি তাকে আপৎকালীন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ দিলাম। মেঝে পরিষ্কার করলাম। দেখা গেল যমজেরা খাবার টেবিলের ওপর ঘুমোচ্ছে। আমার মনে হল, ''কে আমার বেশী আপন, মা না বিড়াল ছানা দুটো? নিঃসন্দেহে, আমার মা। তিনি আমায় জন্ম দিয়েছেন এবং লালন পালন করে এই অবস্থানে এনেছেন।''

যদিও মন চাইছিল না তবু আমি একটা বাক্সে ঘুমন্ত যমজ দুটোকে নিয়ে ভরে সুতো দিয়ে বেঁধে নিলাম। মা ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। আমি মাকে বললাম, ''মা, আমাকে এখন কলেজ যেতে হবে। তুমি কয়েক মিনিটের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে। আমি এক ঘণ্টা পরে ফিরে আসব।''

''ঠিক আছে, তুমি যাও,'' মা উত্তর দেন।

আমি বাক্সটাকে আমার গাড়িতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। শহর ছাড়িয়ে আমি একটা নির্জন জায়গায় গাড়ি দাঁড় করলাম। যমজেরা তখনও ঘুমোচ্ছে। আমি মনকে শক্ত করার চেষ্টা করি। আমি ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা অনুভব করি। আমার কাছে বড়ই কষ্টদায়ক হয় তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আমি কি ঠিক করছি, না ভুল করছি? যদি তাদের এভাবে পরিত্যাগ করতে হয় কেন আমার বাড়িতে তাদের এনেছিলাম? তারা কি আমার সহকর্মীর বাড়িতে সুখে থাকত না? একটার পর একটা মর্মভেদী প্রশ্ন আমার হৃদয়কে তোলপাড় করে দিচ্ছিল। আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সব মানসিক শক্তি একত্র করে আমি বাক্সটা নিয়ে রাস্তার ধারে রাখলাম।

কাঁপা হাতে আমি এটা খুললাম। বিড়াল ছানা দুটো জেগে গিয়েছিল। নতুন পরিবেশে তারা চমকিত হয়। কাঁদতে কাঁদতে আমি তাদের বিদায় জানাই। আমি গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালাতে শুরু করি। যমজেরা গাড়ির দরজার কাছে এল কাঁদতে কাঁদতে। তারা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল না, ''বাবা, তুমি কি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছ? মিনতি করছি, আমাদের ফেলে যেও না। কাতর ভাবে মিনতি করছি আমাদের ত্যাগ করে যেও না। আমরা কিভাবে বাঁচব? কে আমাদের খেতে দেবে? এর চেয়ে ভাল তুমি আমাদের হত্যা করে ফেল?'' আমার চোখের জলের বাঁধ ভেঙে গেল।

হঠাৎ আমার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। মায়ের ফোন। ঈশ্বর! সে কি গুরুতর অসুস্থ? ''মা, কি হয়েছে?'' আমি জানতে চাই।

''বিড়াল ছানা দুটো কোথায়? আমি ত বাড়িতে তাদের দেখতে পাচ্ছি না!''

''মা, আমি তাদের রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি যেহেতু ওরা আমাদের উৎপাত করে।'' আমি বলি।

''তুই কি পাগল হলি? তারা কি ক্ষতি করেছে? তাদের কি আমাদের মত বুদ্ধিশুদ্ধি আছে! তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আয়,'' তিনি কেঁদে উঠেন।

''কিন্তু মা —'' আমি ফিসফিসিয়ে বলি।

''কোন কিন্তু নয়। যদি তুই না পারিস তাহলে তুই আমাকেও পরিত্যাগ করতে পারিস!''

''ঠিক আছে, মা, আমি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসছি,'' আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। আমি প্রাণ ফিরে পেলাম। আমার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হল। দমবদ্ধ অবস্থা এবং মনের কষ্ট চলে গেল। আমি গাড়ি থেকে নামলাম, যমজদের তুলে নিলাম, আদর করলাম, চুমু দিলাম এবং তাদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলাম। আমার মা আবার খুশী হলেন। তিনি তার সঙ্গী সাথীদের ফিরে পেলেন। তিনি ভীষণ একা থাকার অভিজ্ঞতা করেছেন আমাদের বাড়িতে। এখন বিড়াল ছানারাই তার প্রকৃত বন্ধু হল।

''খোকা, আমি এই দেবদূতদের ছাড়া বাঁচব না,'' তিনি বলেন।

''ঠিক আছে, মা, আমি একজন নার্স রাখব। সে তোমাকে এবং বিড়াল ছানাদের দেখাশোনা করবে'', আমি উত্তর দিই।

সন্ধ্যেবেলা আমার স্ত্রী যখন ঘরে ফিরে এল আমি তাকে যা ঘটেছিল সব বললাম। যমজদের প্রতি আমার নিষ্ঠুর আচরণে সে আতঙ্কিত হল। সেও একজন নার্স রাখতে সম্মত হল। যতক্ষণ না একজনকে পাওয়া যাচ্ছে আমরা ঠিক করি যে কয়েক দিনের ছুটি নেব। এই ভাবে আমাদের বাড়িটা আবার স্বর্গপুরী হল!

বিশ্ব পরিবেশ দিবস
World Environment Day

ভারতের কর্ণাটকে বনের সবচেয়ে কুখ্যাত চোর হল কাট্টুরাজা। তার নামটাই বলে যে সে হল বনের রাজা। ছ ফুট লম্বা, তিরিশ বছরের বলিষ্ঠ এই যুবক। তার ঘন কাল গায়ের রং, বন্য মুখে মোচড়ানো গোঁফ। দামী দামী হাজার হাজার বৃক্ষ চুরি ছাড়াও সে অনেক বন্য পশু শিকার করেছে। এমনকি হাতিদেরও হত্যা করেছে তাদের দাঁতের জন্য। রাজ্য সরকার তাকে ধরে দেবার খবর দিলে দশ লক্ষ টাকা দেবেন ঘোষণা করেছেন। সে অনেকবার বনরক্ষকদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে সৌভাগ্যক্রমে কেউ নিহত হন নি।

কাট্টুরাজা হল আদিবাসী মহিলা কানির অবৈধ সন্তান। ষোল বছর বয়সে কানি যখন বনে জ্বালানীর কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল দুজন বন রক্ষক তাকে ধর্ষণ করে। যদিও সে বিষয়টা তার বাবা মা'কে বলেছিল তারা পুলিসে জানাতে যথেষ্ট সাহস পায়নি। এ ছাড়া পুলিশ ফাড়ি তাদের কুড়ে ঘর থেকে অনেকটা দূরে ছিল। তদুপরি নালিশের অর্থহীন চেষ্টা হত যেহেতু দলিত জাতির কান্না কখনো সরকারের মনোযোগ পায় না।

নিরক্ষর কানি এক ছেলের জন্ম দেয়। সে বনের আর সব নিম্নবর্গের ছেলেদের মাঝে জারজ সন্তান হিসেবে বাস করতে থাকে। কাট্টুরাজার যখন দু বছর বয়স কানি এক যুবককে বিয়ে করে। কাট্টুরাজা তার দাদু দিদিমার কাছে থাকত। একমাত্র তার মা ছাড়া সবাই তাকে ঘৃণা করত। মাঝে মাঝে তার মা তাকে দেখতে আসত। মিষ্টি এবং সুস্বাদু যে সব খাবার সে পছন্দ করত এনে দিত।

কাট্টুরাজা শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। ক্রোধ পুষে, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে সে যুবক হয়েছে কারণ এরা তাকে সমাজচ্যুত বলে পরিত্যাগ করেছে। অন্ত্যজ জনসাধারণ দৈন্যদশায় জীবন

কাটায়। তারা সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পায় না যদিও লক্ষ কোটি টাকা তাদের নামে বরাদ্দ হয়। এই টাকা তছরুপ হয় এবং সরকারের কর্মচারীদের দ্বারাই লুঠ হয়। তাদের জন্য হাসপাতাল নেই, স্কুল নেই এমন কি ভাল রাস্তাও নেই। প্রকৃতি অরণ্যের মাধ্যমে যা দেয় তা খেয়েই এরা বেঁচে থাকে - স্ফীত কন্দ, মধু, নদীর ছোট মাছ, ছোট পশুদের যেমন ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, শুয়োরের মাংস ইত্যাদি খেয়ে তারা জীবনধারণ করে।

কাট্টুরাজাকে গ্রামের কাছাকাছি এক স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে সে প্রাথমিক শিক্ষা পায় যা তার চোখ খুলে দেয়। সে শিখেছিল তাদের মত লোকজন সরকার এবং অরণ্যের মাফিয়াদের দ্বারা শোষিত হয়। যুবক হয়ে সে ঠিক করে অরণ্য নিধনকারী হয়ে সে তাদের গোষ্ঠীর লোকজনদের সাহায্য করবে। এই ব্যাপারে তার বন্ধুরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সে বনের দামী দামী গাছ সেগুন, চন্দন, সুগন্ধিগাছ, মেহগনি এবং আরও এই জাতীয় গাছ কাঠ ব্যবসায়ীর দালালদের বিক্রি করে। তারা ঘন গভীর জঙ্গলে এই কাজ করত। বন রক্ষকেরা সেখানে কদাচিৎ টহল দিত। যে টাকা তারা উপার্জন করত তা তারা দরিদ্র পরিবারে বিতরণ করে দিত। সেই টাকা নিয়ে দরিদ্র লোকজন বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাত, যেমন শহর থেকে জামা কাপড় কিনত, অসুস্থদের চিকিৎসা করাত। কাট্টুরাজা এই বেআইনি কাজ করে অপরাধ অনুভব করত না বরং সরকারের ওপর মিষ্টি মধুর প্রতিশোধ বলে মনে করত। ২০১১ সালে ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কাট্টুরাজা বনে একদম একা ছিল এবং চেষ্টা করছিল একটা সেগুন গাছ কাটার। বৃক্ষদের নিজেদের ছুটির দিনে বন এবং সেখানে বসবাসকারীরা দিনটির উদযাপন করছিল। মৃদু মন্দ হাওয়া সব গাছ, পাখী এবং পশুদেরকে যেন চুম্বন এবং আদর করে গেল। প্রকৃতির উল্লাস পাখিদের কিচির মিচির, পাতাদের আনন্দে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়া, সঙ্গিনীকে কাছে ডাকা এবং পশুদের আনন্দাশ্রু তারই প্রকাশ। সেগুনটা তার মৃত্যু ঘণ্টা বুঝে সাহায্যের জন্য কেঁদে ওঠে। মানুষের বোধের অযোগ্য সেই কান্না কাছাকাছি যেসব হাতিরা ঢিপিতে চড়ে বেড়াচ্ছিল তাদের কানে পৌঁছায়।

''এটা কি গাছের সেই ভয়ার্ত কান্না নয়?'' দাঁতাল হাতিটি মাদি হাতিদের জিজ্ঞাসা করে।

''সত্যি, হ্যাঁ তো। আমরা কোন মানুষকে এই বিশেষ দিনে আমাদের আবাসে অনধিকার প্রবেশ করতে দেব না।'' অন্য সব হাতিরা উত্তর দেয়।

''তাহলে তাদের আমরা প্রতিবাদ করি'', দাঁতাল হাতি বলে।

কাট্টুরাজা গাছ কাটার জন্য কুঠার তোলে এবং হুঙ্কার করে হাতিরা তার দিকে তেড়ে আসে। ভীত হয়ে সে (কাট্টুরাজা) রকেট গতিতে গাছে চড়ে বসে। হাতিরা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তার অবতরণের অপেক্ষা করে। সেগুন গাছটা হাতিদের ধন্যবাদ দেয়। তার পাতা ঝরিয়ে করতালি দেয়। যে কাট্টুরাজা তার যৌবনে কোন দিন ভয় কাকে বলে জানত না সে কাঁপতে শুরু করল।

তার মনে হয়েছিল যেন গাছ তার সংগে কথা বলছেঃ ''প্রিয় বন্ধু, আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে তুমি আমাকে হত্যা করবে? ভেবে দেখো, আমি এখনি তোমার ত্রাণকর্তা হলাম। এই অরণ্য এবং এখানকার পশুরা তোমার কি অনিষ্ট করেছে? তুমি কি হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলো নি এবং শত শত পশু শিকার করো নি? তুমি এবং তোমার লোকজন আমাদের উপস্থিতির জন্যই বেঁচে আছো। কোন গাছের ডালে বসে সেই ডালটা কেউ কাটে? যদি তুমি এই অরণ্য ধ্বংস করতেই থাকো কিভাবে এবং কোথায় এই হাতিরা এবং অন্য সব পশুরা বসবাস করবে?''

''আমি খুব দুঃখিত প্রিয় বৃক্ষ। মিনতি করছি আমাকে ক্ষমা করো'', কাট্টুরাজা কাঁদতে শুরু করে হাত জোড় করে। তারপর উচ্চস্বরে সমগ্র অরণ্যকে বলেঃ ''এই অরণ্যের নামে তোমাদের কাছে শপথ করছি যে আমি আর তোমাদের কোন কষ্ট দেব না। অনুগ্রহ করে আমি যে অপরাধ করেছি তার জন্য ক্ষমা করো। এখন থেকে আমি তোমাদের বন্ধু হব। আমার জীবন অরণ্য সংরক্ষণে উৎসর্গ করব।'' তার কণ্ঠস্বর অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হল। সমগ্র অরণ্যানী তার সংরক্ষণের সংকল্পকে আনন্দে স্বাগত জানায়। গাছ দুলে দুলে নেচেছিল, পাখীরা কিচিরমিচির ধ্বনি তুলেছিল, পশুরা আনন্দে কেঁদেছিল। গাছের নীচে দণ্ডায়মান হাতিরা আনন্দে তাদের শুঁড় দুলিয়ে চলে গিয়েছিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাট্টুরাজা গাছ থেকে নেমে আসে এবং আর একবার তার জীবন বাঁচানোর জন্য বৃক্ষটিকে ধন্যবাদ দেয়। সে বাড়ি চলে যায়। পোশাক পরিবর্তন করে নিকটবর্তী শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে চলে যায়। সে ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে ঢোকার অনুমতি চেয়ে প্রার্থনা জানায় এবং তা মঞ্জুর হয়।

সে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে, ''মাননীয় স্যার, আমি কাট্টুরাজা, সেই অরণ্য নিধনকারী যাকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছে। আমি আত্মসমর্পণ করতে এসেছি। আমি যে অপরাধ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আপনি আমাকে গ্রেফতার করুন।''

ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেফতারের আদেশ দেন। তিনি তাকে বলেন, ''এটা ভাল কাজ হয়েছে যে তুমি নিজে আত্মসমর্পণ করছ। এখন তোমাকে জেলে থাকতে হবে এবং বিচার হবে। তোমার যা বলার কোর্টে বলবে।''

কাট্টুরাজাকে সদরের কয়েদখানায় পাঠানো হল। অনুসন্ধানের অঙ্গ হিসেবে পুলিস তাকে অনেক বার বনে নিয়ে গিয়েছিল। সে তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। সে যেখানে যেখানে গাছ কেটেছিল সব দেখিয়ে দেয়। একমাস পর তাকে কোর্টে বিচারের জন্য আনা হল। সরকারী উকিল সরকারের পক্ষে সওয়াল করলেন, কাট্টুরাজা যে যে অপরাধ করেছে তা উপস্থাপন করলেন। কাট্টুরাজার হয়ে লড়ার জন্য কোন উকিল ছিল না। সরকারের উকিল যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন সে (কাট্টুরাজা) সব স্বীকার করে নিয়েছিল। বিচারক তখন কাট্টুরাজাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কোর্টে তার নিজের কিছু বলার বা স্বপক্ষে কিছু বলার যুক্তি আছে কিনা।

কাট্টুরাজা উত্তর দেয়, ''মহামান্য হুজুর, এটা সত্যি যে আমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছি এবং বনের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছি। এখন আমি আন্তরিক ভাবে অনুভব করি যে আমার বনের এবং পরিবেশের প্রতি এতখানি শত্রুতাপরায়ণ হওয়া উচিত হয় নি। আমার সরকারের নিয়ম মেনে চলা উচিত ছিল। মানুষ এবং প্রকৃতির মঙ্গলের জন্য কাজকর্ম সমর্থন করা উচিত ছিল। আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু সরকার যদি আমাকে একটু দয়া করে আমি আমার বাকী জীবনটা অরণ্যকে সমর্পণ করব এবং যে অরণ্য আমি ধ্বংস করেছি তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। কোর্ট আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি কখনোই সরকারের নিয়ম ভাঙব না বরং আমার সর্বশক্তি দিয়ে সরকারের জনমুখী প্রকল্পের রূপায়ণে সহযোগিতা করব। যদি আপনি অনুমোদন করেন আমি বন সংরক্ষণের জন্য আমার বন্ধুদের নিয়ে কর্মী বাহিনী তৈরী করব এবং তাদের নিয়ে বনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করব। আমরা কোন অনুপ্রবেশকারীকে আর বনকে শোষণ করতে দেব না। সেই অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমরা বনে হাজারো বৃক্ষ রোপণ করব এবং এইভাবে এই অরণ্যকে পৃথিবীর আদর্শ অরণ্য তৈরী করব।''

বিচারক উত্তর দেন, ''তোমার কাছ থেকে এই রকম ভাল কথা শুনে কোর্ট খুব সন্তুষ্ট। তোমার প্রতিজ্ঞা মেনে তুমি অসংখ্য অপরাধ করা সত্ত্বেও কোর্ট তোমাকে লঘু শাস্তি দিচ্ছে। তোমাকে এক বছরের জন্য কারাগারে থাকতে হবে এবং এটা হল তোমার জন্য পরীক্ষামূলক শাস্তি। এটা জানার জন্য যে তোমার পরিবর্তন অকৃত্তিম না, কপট। যদি তুমি হৃদয়ের উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারো তোমাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং যেমন তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ সেইভাবে তুমি কর্মী বাহিনী তৈরি করতে পারবে এবং বনের কাজ করতে পারবে।''

কাট্টুরাজাকে সদর জেলখানায় কারাবাসের জন্য পাঠানো হল। সে জেলখানায় বিধি মেনে নম্র আচরণের দ্বারা আদর্শ বন্দী হিসেবে চিহ্নিত হয়। সে জেল কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হয় এবং অন্যান্য কয়েদীদের মনও জয় করে নেয়। তার দেহ মনে রূপান্তর ঘটে। এই ভাবে সে শুদ্ধ এবং পবিত্র সত্তায় পরিণত হয়।

৫ ই জুন ২০১২। বিশ্ব পরিবেশ দিবস। কোর্ট কাট্টুরাজাকে মুক্ত করে দেয় এবং তাকে অরণ্যে ফিরে যেতে অনুমতি দেয়। অরণ্য পাতার মর্মর ধ্বনিতে স্বাগত জানায় সাত্ত্বিক কাট্টুরাজাকে। মৃদু বাতাস তাকে স্পর্শ করে যায়। পাখীরা তাদের গান গায়। বানরেরা তাদের কথা বলে এবং গহন অরণ্যে তাকে নিয়ে যায়। হাতীরা তৃণভুমিতে বিচরণ করছিল, তারা তার আগমন বুঝতে পেরে ডেকে ওঠে। কাট্টুরাজার জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে বনে প্রত্যাগমন ঘটল। অরণ্য তাকে অরণ্য রক্ষক বা ত্রাতা রাজা হিসেবে গ্রহণ করে।

কথা এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাট্টুরাজা তার বন্ধুদের সংগে নিয়ে রক্ষী বাহিনী তৈরী করে। যেখানেই বন্ধ্যা অঞ্চল পরিলক্ষিত হয় উৎসাহী বিভিন্ন বয়সের কুড়ি জনের তরুণ দল পুনরায় অরণ্যায়নের কাজ শুরু করে। বন রক্ষকদের বিশেষ কিছু করার মত কাজ রইল না যেহেতু কাট্টুরাজার দল কখনো অনধিকার প্রবেশকারীদের বৃক্ষ ছেদনের জন্য বনে ঢুকতে দিত না। দু বছর পর, এই অরণ্যটি সমগ্র বিশ্বের কাছে আদর্শ অরণ্য হল এবং 'জাতি সংঘের অরণ্য মানুষের জন্য' পুরস্কার পাওয়ার জন্য দেশ কাট্টুরাজা এবং তার দলকে মনোনীত করে।

পশুদের চেয়ে মানুষের জীবন কি মূল্যবান ?

Is Human Life Precious than Animal's?

অধ্যাপক অ্যান্টনি ফ্রান্সিস এশিয়ানেট নিউজ চ্যানেলে রাত ৯টায় একটা ভিডিওর একটা অংশ দেখে আঁতকে উঠলেন। অতিরিক্ত ভাবে গরু বোঝাই করা একটা চলন্ত ট্রাকের বেষ্টনী থেকে একটা গরু লাফ দিচ্ছে। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ী নদীর ধারার মত চলেছে। গরু নিয়ে ট্রাকটি তামিলনাড়ু থেকে কেরালা আসছিল। প্রতিদিন এই রকম গরু বোঝাই ট্রাক তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কেরালার কসাই খানায় ছোটে। রাস্তার বিধিনিষেধ পর্যবেক্ষণকারীদের উৎকোচ দিয়ে গরু ব্যবসায়ীরা ট্রাক গুলোর বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত গরু নেয়। হতভাগ্য পশুরা ভয়ংকর কষ্ট পায়, ঠিক করে দাঁড়াতে পারে না, বাঁধা থাকায় ক্লান্ত হলে শুতেও পারে না।

গরুটা বোধহয় বিপদ বুঝতে পেরেছিল যে তাকে জবাই করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বা একভাবে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সে নরক থেকে বেরিয়ে যেতে মনস্থির করে। কয়েকবার চেষ্টার পর সে নীচে লাফিয়ে পড়তে সক্ষম হয়। গরু ব্যবসায়ী বা গরুদের মালিক ড্রাইভারের পাশে বসে ট্রাকের কাঁচের মাধ্যমে দেখে এবং তৎক্ষণাৎ ট্রাক থেকে নেমে পড়ে। গরুটা চলন্ত গাড়ির মাঝে দৌড়চ্ছিল মালিকের পিছু নেওয়ার কারণে।

গরুটা রাস্তার ডিভাইডার পার হয়ে বিপরীতমুখী রাস্তা ধরে দৌড়তে থাকে। মালিক আতঙ্কিত হয়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। একটা ট্রাক গরুটাকে ধাক্কা দেয় এবং বিকট আর্তনাদ করে সে পড়ে যায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থর থর করে কাঁপতে থাকে। সে সেই মুহূর্তে মারা গেল। গাড়ি সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মালিক কাঁদতে লাগল গরুটার প্রতি সহানুভূতির কারণে নয়, এর মৃত্যুতে যে আর্থিক ক্ষতি হল সেই কারণে। ভিডিও প্রদর্শনকারী সাংবাদিকও গরুটার জন্য কোন সহানুভূতি বা মৃত্যুর জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করলেন না। তিনি মন্তব্য করেন যে যদি গরুটা

মারা না যেত বা রাস্তাটা নিরাপদে পেরিয়ে যেত মানুষটা তার প্রাণ হারাত কারণ গাড়ি তাকে ধাক্কা দিতে পারত। তার বলার ভঙ্গিটা ছিল এই রকম যে একটা মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে।

অধ্যাপক অ্যাণ্টনির স্ত্রী টেরেসাও টিভি দেখছিলেন এবং সেও ভিডিওর সংবাদদাতার মতই কথা বলে। ''ঈশ্বর গরু ব্যবসায়ীকে রক্ষা করেছেন। একটা গরু মাত্র মারা গেছে। নচেৎ অন্যভাবে এটা ত কয়েক দিনের মধ্যেই জবাই হত,'' টেরেসা মন্তব্য করেন। টেরেসা সেন্ট অ্যানির উওমেনস কলেজে ইংরেজী বিভাগে সহকারী অধ্যাপিকা। কলেজটি সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত এবং শহরের খ্রিস্টান সমাজের দ্বারা পরিচালিত। অধ্যাপক অ্যান্টনি একই শহরে সরকারী কলেজে জুলজির অধ্যাপক।

''টেরেসা, মনে হয়, গরুটার জন্য তোমার কোন দুঃখ হয় নি। আমার মনটা তার করুণ মৃত্যুর জন্য টনটন করছে। মালিকটার জন্য কোনো সহানুভূতি হচ্ছে না। সেই তো গরুটার মৃত্যুর কারণ। সে একজন খুনী।''

''আমরা কেন পশুদের জন্য এত সমবেদনা অনুভব করব? ঈশ্বর পশুদের সৃষ্টি করেছেন মানুষের ব্যবহারের এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। একই ভাবে, এই বিশ্ব সংসারে আর সব সৃষ্টিও। মানুষ কি সব সৃষ্টির কেন্দ্রে নয়? আমরা কি ঈশ্বরের সন্তান নই যিনি তাঁর প্রতিরূপে আমাদের গড়েছেন?''

''যত্ত সব আজেবাজে কথা! কে তোমাকে বলেছে যে মানুষ সব সৃষ্টির কেন্দ্রে? বা ঈশ্বর নিজের প্রতিরূপে মানুষ সৃষ্টি করেছেন?''

''কেন, বাইবেলই তো এইরকম বলে। তুমি কি তা পড়ো নি? কেবলমাত্র আমাদের মানুষদের আত্মা আছে এবং সেহেতু ঈশ্বরের সব সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের। এবং এই কারণেই মানুষ ঈশ্বরের সন্তান।''

''এইখানেই হল সমস্যা। আমি বিশ্বাস করি এবং সাধারণ বোধ আমাকে বলে যে ঈশ্বরের কাছে সব ধরণের সৃষ্টিই সমানভাবে সুন্দর। তাঁর সৃষ্টিতে কুৎসিত বলে কিছু নেই এবং তিনি সব সৃষ্ট বিষয়কে - সজীব এবং নির্জীব উভয় প্রকার সত্তাকে ভালবাসেন। একজন বাবা, মা যেমন সন্তানদের সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সদ্‌গুণ' অপগুণ বিচার না করে ভালবাসেন।''

''শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থপরতার জন্য সে মনে করে যে অন্য সব সত্তার চাইতে সে ঈশ্বরের বেশী প্রিয়।'' তিনি বলতে থাকেন। ''তার বিচার ক্ষমতার কারণে সে নেতিবাচক চিন্তাধারা পোষণ করে। অন্যান্য প্রাণী চিন্তন ক্ষমতা ছাড়া কম স্বার্থপর

এবং মানুষের চাইতে বেশী ধর্মবোধ সম্পন্ন। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা আছে। সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর সর্বব্যাপী আত্মা বা পরমাত্মা। পরমাত্মার প্রকাশ তার সব সৃষ্টিতে, জীব এবং অজীবে বিস্তৃত। এটা ছিল জীবাত্মা বা বিশেষ আত্মা। সেই যে গরুটা মারা গেল হতে পারে আগের জন্মে সে মানুষ ছিল। হতে পারে তার আত্মা আবার মানুষের দেহ ধারণ করবে পরবর্তী সত্তায়।"

"আমি তোমার দর্শন বুঝি না প্রিয়তম। বাইবেলে এমন কিছু আমি দেখিনি"।

"এর সঙ্গে তোমার অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করা উচিত। ভারতীয় হিসেবে তুমি ভারতীয় দর্শন পড়ো এদের তত্ত্ব এবং সংস্কৃতির ভেতরে ডুব দাও। তোমার ভারতীয় মহাকাব্য এবং শাস্ত্র যেমন মহাভারত, রামায়ণ, বেদ এবং উপনিষদ পড়া উচিত। দ্বৈত দর্শনের কিছুটা তুমি অনুসরণ করো যেহেতু খ্রিস্টধর্ম এর ওপর দাঁড়িয়ে। অদ্বৈত বেদান্তও তোমার পড়া উচিত। তাহলে তুমি বুঝবে আমি কি বললাম।"

"তুমি অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকতে আমি কেন এই সব বই পড়তে যাব? যেহেতু আমরা খ্রিস্টান এক ধরণের পরম্পরায় বেড়ে উঠেছি যেখানে পশুদের মনুষ্যেতর প্রজাতি হিসেবে মানা হয় এবং মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুখের জন্য সৃষ্ট বলে মনে করা হয়। আমরা তাদের সহচর ভাবতে এবং তাদের জন্য সহানুভুতি হারিয়ে ফেলেছি। তার ওপর আমরা নিরামিষাশী নই এবং পশুদের জীবনের জন্য আমাদের কোন শ্রদ্ধা নেই।"

"এখন আমার কথা শোন। এই গরু হত্যার বিরুদ্ধে আমি কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাব? সব পশু আমার কাছে আমার সন্তান যেমন এই পৃথিবীর সব মানুষ। এই কারণেই এখন আমি নিরামিষাশী। যদি এমন দুর্ঘটনা তোমার ঘটে আমি কি করব? আমি কোর্টে ফৌজদারি মামলা দায়ের করব। হ্যাঁ, আমি গরু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছি। ওই ব্যবসায়ী গরুটাকে খুন করেছে।"

"অজানা অচেনা তুচ্ছ একটা মৃত গরুর জন্য মামলা দায়ের করবে? কোর্ট কি তোমার আবেদন শুনবে?"

"কেন শুনবে না? আমাদের দেশে পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য। পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধের আইন হয় ১৯৬০ সালে। ১৯৮২ সালে ঐ আইন সংশোধিত হয়। তারপর আরেকটা আইন আছে ভারতীয় পশু কল্যাণ আইন যা চালু হয় ২০১১ সালে। এই আইনে অনিষ্টকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি বিধান আছে। আমি দেখব যাতে গরুর হত্যাকারী সর্বোচ্চ সাজা পায়।"

''তুমি যদি এত বেপরোয়া হও আমার আর কিছু বলার নেই। শুভেচ্ছা রইল তোমার অবলা প্রাণীদের জন্য নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার!''

অধ্যাপক অ্যান্টনি এশিয়ানেট টিভি চ্যানেলের সংগে যোগাযোগ করে ওই গরু বোঝাই ট্রাকটি সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করলেন। তিনি ট্রাকটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেলেন এবং জানলেন খুঁটিনাটি সব তথ্য - এই ট্রাকটির মালিক এবং ড্রাইভার সম্পর্কে তথ্য। ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানলেন যে ট্রাকটির মালিক এবং গরু ব্যবসায়ী ছিল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। তিনিই গরুটির হত্যাকারী। তার নাম অনথাপ্পন। পরবর্তী তদন্তে অধ্যাপক অ্যান্টনি জানলেন যে অনথাপ্পন গত দশ বছর ধরে গরুর ব্যবসা করছেন এবং বহুবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ট্রাক অতিরিক্ত বোঝাই করার জন্য। তার গাড়ি থেকে গরু লাফ দিয়েছে এবং মোটর সাইকেলে চাপা পড়েছে।

প্রয়োজনীয় সব কাগজ পত্র জোগাড় করে অধ্যাপক অ্যান্টনি কেরালা হাইকোর্টে অনথাপ্পনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করলেন যেহেতু তিনি আইন পড়ে আইনের ডিগ্রি ধারী ছিলেন। অধ্যাপক অ্যান্টনি স্থির করেন যে নিজে হাইকোর্টে সওয়াল করবেন। কলেজে তার সহকর্মীরা ব্যঙ্গ সূচক আওয়াজ করলেন যখন তিনি তার সিদ্ধান্ত জানান। কিন্তু তিনি হতাশ হন নি যেহেতু তিনি ভাল করেই জানতেন যে তার এলাকার খুব অল্প সংখ্যক লোকই পশুপ্রেমী।

শুনানির দিন এল। দিনটা ছিল ২০শে এপ্রিল। এপ্রিল মাস পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাস। কোর্টের শুনানির সময় খুব অল্পসংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অনথাপ্পন, তার পরিবার এবং কিছু বন্ধু ছাড়া তার পক্ষের অ্যাডভোকেট উপস্থিত ছিল। অধ্যাপক অ্যান্টনির পক্ষে শুধুমাত্র তার স্ত্রী টেরেসা, এবং তাদের পুত্র কন্যারা। তারা উৎসুক ছিল অধ্যাপক অ্যান্টনি কোর্টে কিভাবে সওয়াল করেন তা দেখবে। বিচারক ছিলেন বৃদ্ধ, ছাই রংয়ের দাড়ি এবং গোল চশমা পরিহিত। তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি অধ্যাপক অ্যান্টনিকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলেন। তখন তিনি বলতে শুরু করেন।

''মহামান্য বিচারক, এপ্রিলের ১ তারিখ ২০১৬ মিস্টার অনথাপ্পনের ট্রাক অতিরিক্ত গরু বোঝাই করে ৪৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাচ্ছিল যখন এটা অংগমালি পৌছায় একটা গরু ট্রাকের রেলিংয়ের ওপর থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে এবং ডিভাইডার অতিক্রম করে পরবর্তী লেনে দৌড়ে যায়। এদিকে অনথাপ্পন তার পিছনে ছোটে। এমন সময় একটা ট্রাক গরুটাকে ধাক্কা দেয়। গরুটা তখনি মারা যায়।

এই খবরটা এশিয়ানেট টিভি সন্ধ্যেবেলা সম্প্রচার করে। আমি জানি যে মৃত এই গরুটার হয়ে সওয়াল করার কেউ নেই সেজন্য আমি এটাকে আমার দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছি। গরুটা তামিলনাড়ু থেকে আসছিল। সে জীবনের মূল্যবান সময়ে সেখানকার লোকজনকে দুধ দিয়েছে, গোবর দিয়েছে এবং যখন সে বৃদ্ধ হল আর তাকে কোনো কাজে লাগবে না তাকে কেরালার কষাইখানায় বিক্রি করে দেওয়া হল"।

"ব্যবসায়ী মিস্টার অনথাপ্পন গরুর নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারতেন এবং প্রায় দশ বছর ধরে তিনি অন্য গরুদের এইভাবে বহন করে চলেছেন। গরু গুলো বহন করার সময় চারপাশে শক্ত বন্ধনী দেওয়া উচিত ছিল। একটা বন্ধনী মাত্র নিয়ে গরু বহন করার সময় তার শক্ত বেড়া বা আবেষ্টনী দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া, পরিবহন সংস্থা দ্বারা আরোপিত পশু পরিবহনের নিয়ম কানুন তার সম্মান এবং অনুসরণ করা উচিত ছিল। পরিবর্তে অনুমোদিত সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী গরু নিয়ে তিনি ট্রাকটি ভর্তি করেছিলেন। হতভাগ্য পশু গুলো ভয়ানক কষ্ট পেয়েছে ঠিক করে দাঁড়াতে পারে নি অথবা ক্লান্ত হলে বিশ্রামের জন্য শুতে পারে নি। এমনকি যাত্রা পথে সে তাদের একটু খাবার জল দিয়েছিল কিনা সন্দেহ। এতক্ষণ সময় প্রচণ্ড তাপে পায়ে যন্ত্রণা এবং প্রচণ্ড ক্লান্তি নিয়ে তারা নারকীয় অবস্থা থেকে পালানোর চেষ্টা করে। গরুটা নীচে লাফায় এবং এইভাবে সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। মিস্টার অনথাপ্পন তাকে তাড়া করে এবং সে তার জীবন বাঁচানোর জন্য পালায় যার পরিণতিতে দ্রুতগতি চলন্ত ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। এবং এইভাবে গরুটার করুণ পরিণতি হয়।

আমি এটাকে মিস্টার অনথাপ্পনের দ্বারা কৃত হত্যা বলে মনে করি। আগেও সে এই রকম ভাবে অপরাধ করেছে এবং তার জন্য জরিমানা দিয়েছে। মহামান্য বিচারক আমি সেই সব তথ্য আপনার কাছে দিয়েছি। গরু হত্যার পরিবর্তে যদি এই রকমটা মানুষের ওপর হত মিস্টার অনথাপ্পন হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হত। মহামান্য বিচারক, অনুনয় করে বলছি মানুষের যে শাস্তি হত সেই শাস্তি এই অনথাপ্পনের প্রাপ্য। মহামান্য আদালত, পশুদের চেয়ে মানুষের জীবন কি বেশী মূল্যবান বা মানুষের তুলনায় পশুদের জীবন কি মূল্যহীন? এই গ্রহে মানুষ এবং অ-মানুষদের দুজনেরই কি সমান দাবী এবং অধিকার নেই? এতটুকুই আমার বক্তব্য, মহামান্য বিচারক।"

বিচারক তখন জানতে চান আসামীর তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অধ্যাপক অ্যান্টনির অভিযোগের উত্তরে কি বক্তব্য। মিস্টার অনথাপ্পনের অ্যাডভোকেট

বিচারকের কাছে অধ্যাপক অ্যান্টনি এবং অনথাপ্পনকে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে সেই অ্যাডভোকেট অধ্যাপক অ্যান্টনিকে প্রশ্ন করলেন সে কি সেই দুর্ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে? অধ্যাপক অ্যান্টনি তখন ব্যাখ্যা করেন যে সরাসরি দুর্ঘটনাটি তিনি প্রত্যক্ষ না করলেও তিনি এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দুর্ঘটনার ভিডিওটি টিভিতে দেখেছেন। এবং তিনি সেই ভিডিওর অংশ সরাসরি এশিয়ানেট চ্যানেল থেকে পেয়েছেন যেটা তারা সম্প্রচার করেছে। এবং সেই ভিডিওটি কোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে। বিচারক অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন।

মিস্টার অনথাপ্পনকে অ্যাডভোকেট প্রশ্ন করলেন। সে অভিযোগ অস্বীকার করতে পারে না বরং স্বীকার করে নেয় যে তার ট্রাক অতিরিক্ত গরুতে ভর্তি ছিল এবং গরুদের সুরক্ষার জন্য সঠিকভাবে বেষ্টনী দেওয়া হয় নি, গরু নীচে লাফিয়ে পড়ে এবং অ্যাকসিডেন্টের মুখে পড়ে। সে কোর্টের দয়া প্রার্থনা করে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে ভবিষ্যতে সে নিয়ম মেনে চলবে। এবং এই রকম করুণ বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবে না। অধ্যাপক অ্যান্টনি তখন কোর্টকে মনে করিয়ে দেন যে অনথাপ্পন এইভাবে আগেও বিচার চলাকালীন কোর্টকে আশ্বাস দিয়েছিল এবং একই অপরাধ সে বারে বারে করেছে নামমাত্র জরিমানা দিয়ে।

জিজ্ঞাসা পর্ব সমাপ্ত হলে বিচারক রায় দেন, ''যেহেতু গরুকে অসহনীয় ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে যার করুণ পরিণতিতে তার মৃত্যু হয়েছে মিস্টার অনথাপ্পন ভারতীয় পশু কল্যান আইন লঙ্ঘন করেছে। তার কাজ ফৌজধারী অপরাধ হিসেবে প্রমাণিত। যদিও বারে বারে কোর্টের সাবধান করা সত্ত্বেও সে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নি বা অনুশোচনা বোধ করে নি। সেহেতু আইন অনুমোদিত সর্বোচ্চ শাস্তি তার প্রাপ্য। অনথাপ্পন তিন বছরের জন্য কারাগারে থাকবে এবং তাকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে যা পশু কল্যাণের জন্য ব্যয় হবে।'' অনথাপ্পন এবং তার পরিবার এবং বন্ধুরা এইরকম ব্যতিক্রমী রায় শুনে হতাশ হল। অন্যদিকে অধ্যাপক অ্যান্টনি ফ্রানসিস এবং তার পরিবার উল্লসিত মনে বাড়ি ফিরল। অধ্যাপক অ্যান্টনি মৃত গরুর আত্মার কথা শুনেছিলেন। সে বলছেঃ ''আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ প্রিয় দাদা। আপনি আমার মৃত্যুর যথাযথ প্রতিশোধ নিয়েছেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন!''

বহুসংস্কৃতি সমন্বয়

Multicultural Harmony

অমর, আকবর এবং অ্যান্টণী তিন প্রতিবেশী। তাদের তিন পরিবারের মধ্যে মধুর সম্পর্ক। তিনটি পরিবার ভারতবর্ষের কেরালা প্রদেশের কোট্টাম জেলার দেবলোকম গ্রামে বাস করত। স্থানটি ঈশ্বরের নিজের দেশ হিসেবে জনপ্রিয়। দেবলোকম নামটিই এই ইঙ্গিত বাহী। বাস্তবিক স্বর্গীয় ভূমি - ভৌগলিক অবস্থান এবং লোকজন তাতে স্বর্গীয় মহিমা আরোপ করেছে। রবার চাষ, নারকেল গাছ, ধান ক্ষেত এবং প্রবহমান ছোট ছোট নদী সাপের মত এঁকেবেঁকে গ্রামটিকে চিরসবুজ এবং অতুলনীয় মনোরম করে রেখেছে। মনে হয় লম্বা নারকেল গাছ ধরে ঈশ্বর এখানে নেমে এসেছেন। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের সংগে যোগাযোগ রেখেছেন। এখানে বেশীর ভাগ মানুষ হিন্দু এবং খ্রিস্টান, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক অল্প। তারা সবাই মিলেমিশে পারস্পরিক সমন্বয় রেখে বসবাস করত। সেই অঞ্চলের মন্দির, গির্জা, মসজিদে এই আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা হয়।

অমর ছিল চাষি, সে এবং তার স্ত্রী সীতা ছেলে আনন্দ এবং অশ্বথীকে নিয়ে বাস করত। তার পাঁচ একর চাষের জমি তাতে রাবার চাষ, ধানক্ষেত, নারকেল গাছ প্রভৃতি ছিল। অমর এবং সীতা উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে দশম শ্রেণীতে পাশ করে ছিল। যখন গল্পটা শুরু তাদের ছেলে আনন্দ দশম শ্রেণীতে পড়ে এবং অশ্বথী সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে।

আকবর একজন কাঠ ব্যবসায়ী। তার স্থাবর সম্পত্তি বেশী নেই সে ব্যবসা থেকেই রোজগার করে। সে তার স্ত্রী রমলা, মেয়ে লায়লা এবং ছেলে ওয়াহবকে নিয়ে সুখে বাস করে। আকবর এবং রমলাও উচু ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। এর মধ্যে আকবর নবম শ্রেণী এবং পরের জন রমলা দশম শ্রেণীর পড়া শেষ করেছে। লায়লা দশম শ্রেণীতে পড়ে আনন্দের মত এবং ওয়াহব অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে।

অ্যান্টনি কোট্টামে শিক্ষা বিভাগের একজন বরিষ্ঠ কেরাণী। সে প্রাক স্নাতক কোর্সে পাশ করে ছিল। সে তার স্ত্রী আলফোনসার সংগে বাস করত। সে গৃহবধূ এবং দশম শ্রেণীতে পাশ করে ছিল। তাদের একটি মেয়ে শিলিন। আনন্দ এবং লায়লার মত সে দশম শ্রেণীতে পড়ত। তাদের ছেলে জোশেফ সপ্তম শ্রেণীতে পড়ত মেয়ে অশ্বথীর সংগে। দেবলোকমের সব প্রতিবেশীদের বাচ্চারাই সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে যেত।

অমর, আকবর এবং অ্যান্টনিও একসঙ্গে একই স্কুলে পড়ে ছিল নবম শ্রেণী পর্যন্ত, আকবর নবম শ্রেণীতে ফেল করে অবং অন্যরা দশম শ্রেণীতে উঠে যায়। তাদের কখনো মনে হয় নি যে তারা ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের মা বাবা এমন ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাবে তাদের গড়ে তুলেছিলেন যে তাদের সমাজ জীবনে মেলামেশায় কোন বিভেদের প্রাচীর গড়ে ওঠে নি। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ওনম, বিষ্ণু, খ্রিসমাস, ইস্টার, রমজান, বকরীদ্ ছিল তাদের সাধারণ উৎসব এবং তারা তা উদ্‌যাপন করত। একে অপরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করত।

এক দিন স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে অ্যান্টনি বলেছিলঃ ''আজ আমাদের জীবন বিজ্ঞানের (বায়োলজি) শিক্ষক কি শিখিয়েছেন তোমরা কি খেয়াল করো নি? তিনি আমাদের বিবর্তন তত্ত্ব পড়াচ্ছিলেন। এই তত্ত্ব প্রমাণ করে যে মানুষ বিবর্তিত হয়েছে বানরের মত পূর্বপুরুষদের থেকে। কিন্তু আমাদের বাইবেল শেখায় যে ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমকে এই পৃথিবী থেকে তৈরী করেছিলেন এবং তাতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন এবং প্রথম নারী ইভকে সৃষ্টি করেছিলেন আদমের পাঁজর থেকে। এবং সমগ্র ব্রহ্মান্ড তাদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন।''

আকবর উত্তর দেয়ঃ ''হ্যাঁ, জেনেসিস বইতে এই বিষয়টাই পড়ানো হয়েছে।''

তখন অমর বলেছিলঃ ''তোমরা রবিবারের স্কুল এবং মাদ্রাসা থেকে যা শেখো আমাদের স্কুলে সেই রকম কিছু শেখানো হয় না। আমাদের হিন্দুদের ধর্মীয় কিছু শেখানো হয় না। আমরা আমাদের শাস্ত্র পড়ি এবং আমাদের মা বাবা আমাদের ধর্মের মহৎ শিক্ষা দেন। আমরা জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় বিশ্বাস করি। এবং আর সব প্রাণী মানুষের ভাই বোন। ঐশ্বরিক উপাদান সমগ্র সৃষ্টি জড় এবং অজড়ে আছে। আমার মতে বিজ্ঞান যা শিখিয়েছে আমাদের তা বিশ্বাস করা এবং অনুসরণ করা উচিত। কারণ এটা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য। বানর এবং মানুষের মিল অনেক। আমরা কেনই বা বিশ্বাস করব না যে মানুষ বানর থেকেই বিবর্তিত?''

আকবর এবং অ্যান্টনি অমরের মত মেনে নেয়। আকবর আরও বলেঃ ''বিবর্তন

যখন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় পিতা ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং সমগ্র সৃষ্টি হল তার সন্তান। অতএব স্বাভাবিক নিয়মে এই পৃথিবীতে আমরা মানুষেরা অন্যান্য প্রাণীদের ভাইবোন। ঈশ্বর এবং মানুষের সম্পর্ক হল পিতা-পুত্রের সম্পর্ক তাহলে কেন এত ধর্ম এবং ঈশ্বর আমাদের মধ্যে?"

অ্যান্টনি উত্তর দেয়, ''বন্ধু, তুমি যা বললে একশ ভাগ সত্যি। বাস্তবিক, মানুষের ক্ষমতা লাভের বাসনা এবং সম্পদ লাভের তৃষ্ণারূপ স্বার্থপরতা থেকে ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে। এখন ধর্মের অবনমন ঘটে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে তাদের প্রাথমিক অভিপ্রায় হল অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণকে শোষণ করা।"

অমরঃ ''একদম খাঁটি কথা বলেছ প্রিয় বন্ধু। যখন আমরা জানি যে পিতা ঈশ্বর সমগ্র ব্রহ্মান্ডের স্রষ্টা আমাদের কেন কোনো ধর্মকে ভালবাসা এবং আমাদের পিতাকে সন্মান করার দরকার হয়? ঈশ্বর আমাদের বৈভব ও যুক্তি দিয়েছেন, কোন্‌টা ঠিক এবং কোন্‌টা ভুল বিচার করার সক্ষমতা দিয়েছেন। এছাড়া, আমাদের দেশে সরকারী এবং নাগরিক নিয়ম কানুন আছে এবং আমরা জানি যে প্রকৃতির নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হবে।'

ইতিমধ্যে তারা তাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে যায় এবং উপযোগী আলোচনায় ইতি পড়ে যায়।

অনেক বছর অতিক্রান্ত। তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল এবং তিনটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছিল। তাদের কখনো মনে হয় নি যে তারা ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত। বরং তারা এমন ভাবে বসবাস করত যেন তারা যৌথ পরিবারের সদস্য। অমরের ছেলে আনন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে উইপ্রো কোম্পানিতে নিযুক্ত হয়েছিল। অ্যান্টনির মেয়ে শিলিনও আনন্দের সংগে একই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিল এবং প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক হয়ে ব্যাঙ্গালোরে সেই একই উইপ্রো কোম্পানিতে চাকরী পেয়েছিল।

তারা স্কুলে পড়াকালীনই একে অপরের প্রেমে পড়েছিল কিন্তু তাদের সম্পর্ক একদম লুকিয়ে রেখেছিল এই আশংকায় যে তাদের পিতা মাতা তাদের ভিন্ন জাতের বিয়েতে আপত্তি করতে পারেন। তারা খুব ভাল করেই জানত যে বাবা মা যদিও বা মেনে নেন সমাজ এবং ধর্মীয় নেতারা নিশ্চিত আপত্তি করবেন কারণ কেরালার সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে ভীষণ উন্মাদ। কিন্তু ভালবাসা তো ধর্মের বেড়া মানে না, কপোত কপোতীর মত তাদের ভালবাসা লোক চক্ষুর আড়ালে বহমান ছিল। বাবা মা আপত্তি করলেও তারা কয়েক বছর পর বিয়ে করবে ঠিক করে ফেলেছিল।

অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়ে মাসে একবার তারা বাড়ি আসত। রবিবার ছুটি। সুতরাং তারা পুরো দুটো দিন থাকার জন্য সময় পেত। তারা রাত্রের বাসে যাতায়াত করত। এক রবিবার শিলিন যখন বাড়িতে ছিল তার বাবা অ্যান্টনি তাকে তার ঘরে ডাকলেন। তার মা আলফোনসাও সেখানে ছিলেন।

অ্যান্টনি বলেন, ''শিলিন তোমার এখন ২৫ বছর চলছে। আমরা তোমার বিয়ের ব্যাপারে ভাবছি। প্রতিবেশী এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনেরাও জানতে চাইছে কবে বিয়ে হবে।''

শিলিন উত্তর দেয়, ''বাবা, আমাদের এত তাড়াহুড়োর কি আছে? আর দুটো বছর অপেক্ষা করো।''

তখন আলফোনসা মন্তব্য করলেন, ''কেন আমরা অপেক্ষা করব? এর মধ্যেই দেরী হয়ে গেছে। আমাদের কোন দায় নেই। তাহলে কেন আমরা অপেক্ষা করব?''

অ্যান্টনি বলেন, ''কেন তুমি এখন বিয়েতে আপত্তি করছ? তুমি কি কারো অপেক্ষায় আছো? আমি বলতে চাইছি, তোমার পছন্দের কেউ কি আছে? খোলাখুলি আমাদের বলো।''

শিলিন সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দিয়েছিল, ''হ্যাঁ বাবা, আমি একজনকে ভালবাসি।''

আলফোনসা জিজ্ঞাসা করেন, ''সে কে?''

শিলিন বলে, ''আমি আনন্দকে ভালবাসি এবং আমরা বিয়ে করব ঠিক করেছি''।

আলফোনসা এবং অ্যান্টনি এই কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন। তারা ক্রোধে ফেটে পড়লেন, ''না, আমরা তোমাকে এই বিয়ে করতে দেব না।''

শিলিন একাজ করবে স্থির করেই ফেলেছিল। ''আনন্দকে বিয়ে করতে দোষটা কোথায়? সে কি ভাল ছেলে নয়? তোমরা তাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসো, ভালবাসো না কি? সে কি যথেষ্ট সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান নয়? জীবন যাপনের জন্য সেকি মোটা অংকের বেতন পায় না? তাদের পরিবার কি মর্যাদা সম্পন্ন পরিবার নয়? তার মা বাবা কি তোমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়? তাহলে কেন তোমাদের আপত্তি?''

অ্যান্টনি বলেন, ''বেটি, আনন্দ এবং তার পরিবার সম্পর্কে যা বললে সব সত্যি। কিন্তু তারা যে অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর। তুমি কি মনে করো আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং চার্চের পাদ্রী এই বিয়ে মেনে নেবে?'' তুমি কি জান যদি বিয়েটা ঘটে তাহলে আমরা

সমাজচ্যুত হব? আমরা কিভাবে এখানে বাস করব আমাদের ধর্মকে উপেক্ষা করে?

শিলিন উত্তর দেয়, ''বিষয়টা সত্যি, আমরা এই বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন এবং আমরা ঠিক করেছি যে বিয়ের পর আমরা ব্যাঙ্গালোরে থাকব। কোন ধর্মই সেখানে আমাদের জ্বালাতন করবে না। এখানের এই সমাজটা এমনই ধর্ম নিরপেক্ষ। আনন্দ বলেছে যে যদি তার মা বাবা বিয়েতে আপত্তি করে হিন্দু রীতিতে আমরা আইনানুগ রেজিস্ট্রারের অফিসে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করব।''

অ্যান্টনি বলেন, ''আমি যতদিন জীবিত আছি আমি এই বিয়ে মেনে নেব না।''

একথা বলে সে পাশের বাড়ির অমরের সঙ্গে দেখা করতে বেড়িয়ে পড়ে। সেখানে গিয়ে সে ডাকে, ''অমর, বাইরে এসো। তোমার ছেলেকেও ডাকো।''

''সুপ্রভাত অ্যান্টনি। ব্যাপার কি? কি হয়েছে?''

''তোমার ছেলে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করো। আমরা তোমার এবং তোমার পরিবারের কি ক্ষতি করেছি? তোমার ছেলে আমাদের বদনাম করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের ধর্মের নিয়ম বিরুদ্ধ কাজে জড়িয়ে আমাদের ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা করছে। আমরা এখানে ভাই হিসেবে বসবাস করছিলাম এবং তোমার ছেলে কিভাবে আমাদের বদনাম করে আমার মেয়েকে বিয়ের পরিকল্পনা করেছে? তোমার ছেলেকে বুঝিয়ে এই সম্পর্ক ভেঙে দাও। তাছাড়া ধরে নেব তুমি এতে মদত দিয়েছ। আমরা কখনোই এই বিয়ে সমর্থন করব না।''

অমর উত্তর দেয়, ''অ্যান্টনি বুঝে শুনে কথা বলো। তুমি কি মনে করো যে আমরা ছেলেকে ভিন্ন ধর্মের বিয়েতে প্ররোচিত করেছি? তুমি কেন তোমার মেয়েকে বুঝিয়ে ভালবাসা থেকে নিবৃত্ত করাচ্ছ না?''

''তোমার ছেলে তাকে প্রলোভিত করেছে তাছাড়া সে কখনো এই রকম ফাঁদে পড়ত না।''

অমর তখন সমান ভাবে রেগে গেল। ''এক দম চুপ করো এবং আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। তোমার মেয়েই আমার ছেলেকে সম্মোহিত করেছে।''

''আমি এখানে থাকতে আসি নি সাবধান করতে এসেছি। তোমার ছেলেকে এই অভিসন্ধি ছেড়ে দিতে বলো। তার নিজের ধর্মের কোন মেয়েকে খুঁজে নিতে বলো। তুমি বা তোমার পরিবারের কেউ আর আমাদের আঙিনায় পা রাখবে না'' একথা বলে সে বাড়ি চলে গেল।

এইভাবে অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু অমর এবং অ্যান্টনি একে অপরের শত্রু হয়ে গেল। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব ধর্মের তীরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ধর্ম মনকে এক সুত্রে গাঁথে কিন্তু এখানে দুই পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আকবর অমর এবং অ্যান্টনি এবং তাদের পরিবারের মনোমালিন্য মেটানোর ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছিল। কিন্তু দুটো পরিবারই ধর্মীয় অনুভূতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ছিল তার দৌত্য বধিরকে কিছু বলার মত হয়েছিল। তবু গোপনে আনন্দ এবং শিলিনের প্রেম বজায় ছিল। দুই পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয় স্বজন এই প্রেম এবং তাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত ভেঙ্গে দিতে উঠে পড়ে লাগে। পাদ্রী অ্যান্টনির বাড়ি এসেছিলেন এবং সাবধান করে গিয়েছেন যদি বিয়েটা ঘটে তাহলে কি কি হতে পারে।

বলার অপেক্ষা রাখে না পরিবারের সদস্যদের আত্মীয় স্বজনের এবং ধর্মীয় নেতাদের থেকে ধেয়ে আসা অভিযোগ এবং ভয় দেখানো শিলিনের মনের ওপর প্রবল চাপ ফেলে, তার শান্তি নষ্ট করে। কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড মাথায় যন্ত্রণা হওয়ায় সে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। হাসপাতালে সে ভর্তি হয় এবং দেখা যায় তার রক্ত চাপ প্রচুর বেড়ে গেছে। এমনকি হাসপাতালে বেশ কয়েক দিনের চিকিৎসাতেও রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় নি। নির্ণয় হয় অত্যধিক ব্লাড প্রেসার তার কিডনির ক্ষতি করেছে। তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে।

তাকে শহরে কিডনি বিশেষজ্ঞের কাছে নেওয়া হয়েছিল। শিলিন আনন্দকে দেখতে চেয়েছিল কিন্তু আনন্দ তাকে হাসপাতালে দেখতে যেতে ভয় পায়। কারণ তার বাবা মা তাকে স্বাগত জানাবে না। সে শুধুমাত্র তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করতে পারে। পরবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেল তার দুটো কিডনিই এতটাই খারাপ যে শুধু কিডনি প্রতিস্থাপনই তার জীবন বাঁচাতে পারে।

অ্যান্টনি যথেষ্ট ধনী ছিল না যে হাজার হাজার টাকা দিয়ে কিডনি দাতা খুঁজবে।

দেবলোকম গ্রামের সবাই এই করুণ কাহিনী জেনে যায়। সবাই তার জীবনের জন্য প্রার্থনা করে। প্রতিবেশী, পাদ্রী, মন্দিরের পূজারী, মসজিদের ইমাম তাকে হাসপাতালে দেখতে যান এবং অ্যাণ্টনির পরিবারের কাছে তারা সবাই তাদের দুঃখ এবং উদ্বেগ জানান। যেহেতু শিলিন আই সি ইউতে (ICU) ছিল তারা শুধুমাত্র কাঁচের জানালা দিয়ে তাকে এক ঝলক দেখেন।

আনন্দ আকবরের মাধ্যমে সব খবর নেয়। সে তাকে বলে যে সে তার প্রিয়তমার জন্য একটা কিডনি দান করতে ইচ্ছুক। আকবর অ্যাণ্টনি এবং তার পরিবারকে আনন্দের অভিপ্রায় জানায়। যেহেতু তাদের মেয়েকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র

খড়কুটো অ্যান্টনি এবং আলফোনসা এই প্রস্তাবে রাজী হন। তারপর আকবর অমরের বাড়ি যায় এবং আনন্দের ইচ্ছা তার বাবা মা অমর এবং সীতার কাছে প্রকাশ করে। তারা আনন্দের ইচ্ছার কথা শুনে আতঙ্কিত হয়। তখন অমর তার ছেলেকে ডেকে বলেন, ''আনন্দ কি বোকার মত কথা বলছ? তুমি সদ্য যুবক। একটা কিডনি নিয়ে তুমি কি করে বাঁচবে? যদি এইটা কোন ভাবে কোন অসুখে দূষিত হয় তোমার জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে।''

আনন্দ উত্তর দেয়, ''বাবা, আমি শিলিনকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবন গড়তে চাই না। সুতরাং তার জীবন বাঁচানোর জন্য আমি যে কোন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাছাড়া, এমন অনেক মানুষ আছে যারা একটা কিডনি দান করে সুস্থ ভাবে বেঁচে আছে। যদি জীবন শৈলী সম্পর্কে আমরা সতর্ক থাকি আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। আমি একটা কিডনি দেব সিদ্ধান্ত নিয়েছি যদি তারা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়।''

অমর বলেন, ''যদি এটা তোমার সিদ্ধান্ত হয় তবে তাই করো। কারো জীবন রক্ষা করা মহৎ সাত্ত্বিক কর্ম।''

আকবর এই দারুণ খবরটা অ্যান্টনি এবং আলফোনসাকে জানিয়ে দেয়। তারা এ কথা শুনে আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। খবরটা গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন আনন্দের মহান এই সিদ্ধান্তকে অনেক প্রশংসা করে। আনন্দকে হাসপাতালে ডাকা হল এবং তার কিডনি শিলিনের দেহে স্থাপন করা যাবে কিনা এই বিষয়ে যাবতীয় ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করা হল। সৌভাগ্য ক্রমে আনন্দ এবং শিলিন দুজনেরই রক্তের ABO গ্রুপ এবং প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এটা কার্যকরী তা একাধিক পরীক্ষার মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা হল।

কিডনি দানের সব নিয়মকানুন শীঘ্রই সম্পন্ন হল এবং আনন্দের কিডনি সফল ভাবে প্রতিস্থাপিত হল কয়েক ঘণ্টা কাটাছেঁড়া করে। দুশ্চিন্তা মুক্ত এবং আনন্দে উল্লসিত হয়ে অমর এবং অ্যান্টনি একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। চোখে জল নিয়ে একে অপরের ক্ষমা চায়। একই ভাবে সীতা এবং আলফোনসা একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু ফেলে। আকবর এবং তার পরিবারও দুই পরিবারের পুনরায় মিলনে অংশ গ্রহণ করে।

পাদ্রী, পূজারী, এবং ইমাম সমেত হাজারের বেশী গ্রামবাসী অপেক্ষা করছিল হাসপাতালের বাইরে কি হল জানার জন্য। তারা সবাই সফল কিডনি প্রতিস্থাপনে আনন্দিত হয় এবং একে অপরকে মিষ্টি মুখ করায়। অমর, অ্যান্টনি, আকবর এবং

তাদের পরিবার অপারেশন বিভাগ থেকে বেরিয়ে আসছিল। তারা পূজারি, পাদ্রী এবং ইমামকে অনুরোধ করে তাদের কাছে আসতে। তখন অ্যান্টনি বলেন, ''শ্রদ্ধেয় পূজারি, শ্রদ্ধেয় ফাদার, শ্রদ্ধেয় ইমাম এবং আমার প্রিয় গ্রামবাসী আপনাদের জানাচ্ছি যে আনন্দর ত্যাগে আমার মেয়ে জীবন ফিরে পেয়েছে। সুতরাং অমর এবং আমি নিজে এবং আমার পরিবার ঠিক করেছি যে শিলিন এবং আনন্দের বিয়ে দেব। মাস তিনেক পরে একটা শুভ দিন দেখে বিয়ে সম্পন্ন হবে। এবং বিয়েটা হবে হিন্দু রীতি মেনে।'

তখন অমর বলেন, ''আমরা অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় পূজারি, ফাদার এবং ইমামকে - আপনারা সবাই সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের ছেলে মেয়েকে আশীর্বাদ করবেন।''

পূজারি বলেন, ''পবিত্র দুটি আত্মার মিলনের সাক্ষী আমরা বড়ই খুশী।''

পাদ্রী আরও একটু সংযোজন করেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই তাদের অঙ্গ ভাগাভাগি করে তাদের মিলন ঘটালেন। আমাদের ধর্ম বিষয়টা এই অর্থে গ্রহণ করবে এবং আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন করব। আমরা সেই অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকব এবং আদর্শ যুগলকে আশীর্বাদ করব।''

ইমাম বলেন, ''এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং কোনো মানুষের এতে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। আদর্শ এই জুটিকে আশীর্বাদ করতে অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকব।''

এইভাবে ৯ই নভেম্বর মহা বিষ্ণু মন্দিরে আনন্দ শিলিনকে বিয়ে করে। পূজারি নিয়ম রীতি সম্পন্ন করিয়ে ছিলেন। দুজনকে আশীর্বাদ করে সর্বক্ষণ পাদ্রী এবং ইমাম পূজারির পাশে ছিলেন। গ্রামের অধিবাসীরা উপস্থিত হয়েছিল। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর রাত্রে নিরামিষ ভোজন ছিল, সকলে আনন্দের সংগে পেট ভরে ভোজন করে।

বিশ্বে বৃহত্তম বহু সংস্কৃতির দেশে এটা হয়েছিল স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এটা ভারতের মনোমুগ্ধকর ছবিতে অপূর্ব সৌন্দর্য্য সংযোজন করেছিল - বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। আরেকটি মনোগ্রাহী এক সুতো সংযুক্ত হয়েছিল বহু সংস্কৃতির ঐকতান এবং ভারতের সংহতিতে। এটা দেখে সমগ্র বিশ্ব মুচকি হাসি হেসেছিল।

ক্লেমেন্টের ইউ এ ই (UAE) থেকে প্রত্যাবর্তন
Clement's Return from UAE

''তুমি কি টিকিট বুক করেছ প্রিয়তম? আমরা সবাই তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তায় আছি। তুমি সেখানে ভাল আছো তো?'' মারলিন ফোনে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে।

''আমার জন্য কোন দুশ্চিন্তা কোরো না, আমি একদম ঠিক আছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি পরের রবিবার প্লেনে কোচি যাওয়ার টিকিট পেয়েছি। প্লেন ২-৩০ এর মধ্যে পৌছে যাবে। আমি এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব এবং সন্ধ্যের আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব। বাবা এখন কেমন আছেন? তোমরা কি তার হাঁপানির কষ্টের জন্য ফোনের মাধ্যমে ওষুধ পেতে পারো? মীনা এবং জ্যাশন কি ঘুমিয়ে?''

''খুবই আনন্দের খবর যে দীর্ঘ অপেক্ষার পর তুমি টিকিট পেয়েছ। ছেলে মেয়েরা ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। যেহেতু নিয়মিত ক্লাস এবং বাড়ির কাজ নেই তারা ৯-৩০শেই বিছানায় চলে গেছে। আমি ডাক্তারের থেকে অন লাইনে প্রেসক্রিপশন পেয়েছি এবং গতকালই বাবার ওষুধ কিনে এনেছি। এখন বর্ষাকাল তার অবস্থা খারাপের দিকে। ও হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি এখন আক্রান্ত জোনের মধ্যে। তুমি সোজা বাড়ি চলে আসবে এবং কোথাও নামবে না।''

''ঠিক আছে, প্রিয়া আমি প্রতিদিন খবরের দিকে নজর রাখছি। যেহেতু প্রবাসীরা অনেক সংখ্যায় সেখানে আসছে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে দিনে দিনে। বাস্তবিক আমরা সবাই পালিয়ে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি সেখানে আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য। আমরা নিশ্চিত যে আমাদের কেরালা সরকার আমাদের রক্ষা করবেন। আমাকে ১৪ দিনের জন্য আলাদাভাবে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে পরিবারের অন্য সদস্যদের সংগে মেলামেশায়। সুতরাং মাকে বলো আমার জন্য একটা ঘর ফাঁকা রাখতে। রান্না ঘরের পাশে হলেও হবে। সেখানে অসুবিধে

হবে কিন্তু আমাদের তা মেনে নিতে হবে। যতক্ষণ না কোয়ারেনটাইন পেরিয়ে যায় ততক্ষণ মেনে নেওয়াটা জরুরী। শুভ রাত্রি প্রিয়া ! আমি আগামী কাল ফোন করব।"

ক্লেমেন্ট ইতিমধ্যে ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন যখন মারলিনের ফোনটা এসেছিল নিদ্রা দেবী দ্বিধান্বিত ভাবছেন আসবেন কি আসবেন না। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দিলেন, তার মন এঁকেবেঁকে অতীত সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে থাকল। তার মনটা শৈশবে ডুব দিল এবং তিনি স্মৃতি চারণ করতে থাকলেন।

ক্লেমেন্টের বয়স এখন ৪০। জন্মেছেন এবং লালিত পালিত হয়েছেন দরিদ্র পরিবারে। তার বাবা ছিলেন অটোরিক্সা চালক এবং মা ছিলেন গৃহবধূ। এই বাবা'ই এখন হাঁপানি রোগী। ক্লেমেন্টের ছোট একটা বোন ছিল তার বিয়ে হয়ে গেছে। যেহেতু সে ছিল পড়াশোনায় খুব আগ্রহী ক্লেমেন্টকে সরকারী কলেজে বি.এ পাশের জন্য পাঠানো হয় এবং তারপর সে গণিতে এম.এসসি করে। যদিও সে পোস্ট গ্রাজুয়েটে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে সে সরকারী চাকরী পায় নি। সে খুব অল্প বেতনে টিউশন সেন্টারে দু বছর প্রশিক্ষকের কাজ করেছে। এদিকে তার কলেজের এক সহপাঠী অরবিন্দ তাকে আমন্ত্রণ জানায় ইউ এ ইতে যাবার জন্য। সেখানে সে একটা শপিং মলে হিসাব রক্ষকের কাজ করত, অরবিন্দ ক্লেমেন্টকে তার ভিসা এবং যাতায়াতের খরচ দেয়। এইভাবে অরবিন্দের বদান্যতায় ক্লেমেন্ট ইউ এ ইতে যায় এবং হিসাব রক্ষক হিসেবে অন্য একটা শপিং মলে কাজ করতে শুরু করে। বেতন খুব একটা আকর্ষণীয় ছিল না কিন্তু কেরালায় যা সে উপার্জন করত তার তুলনায় মন্দ নয়। তার নিজের খরচ মিটিয়ে সে প্রতি মাসে ৩০০০০টাকা জমাতে পারত এবং সেই টাকাটা নিয়মিত তার বাবার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিত। তিন বছর পর তার পাঠানো সেই টাকা দিয়ে তার বাবা দু হাজার স্কোয়ার ফুটের কিছু বেশী জমি কিনে একটা ছোট বাড়ি করেছিলেন। আগে তারা ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন। ক্লেমেন্টের বোনের বিয়ে হয় আরও দু বছর পর ক্লেমেন্টের জমানো টাকায়। তারপর ক্লেমেন্টের বিয়ে হয় মারলিনের সঙ্গে সেও গরীব ঘরের ছিল। ক্লেমেন্ট যেহেতু পণ প্রথার বিপক্ষে সে তাদের পরিবার থেকে কোনো যৌতুক নেয় নি। মারলিন ছিল সুশ্রী, স্নেহময়ী, নম্র এবং ভদ্র। তাদের দুটো সন্তান হয় বড়টি মেয়ে মীণা। সে এখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে এবং ছোটটি ছেলে জ্যাশন প্রথম শ্রেণীতে পড়ে।

কোভিড ১৯ ইউ এ ই সহ অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলোয় ছেয়ে গেছে। এবং লকডাউন এপ্রিলের ৫ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। লক ডাউনের অঙ্গ হিসেবে

ক্লেমেন্ট দুবাইতে কাজ থেকে ছাঁটাই হয়েছে। অতিমারি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দাবানলের মত এবং বন্যার স্রোতের মত সেখানকার হাসপাতালে রোগীর ঢল নামে। ইউ এ ইর এক কোটী জনগণের মধ্যে কেরালার লোক দশ লাখ। সেখানে বসবাসকারী কেরালার চার ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা দুতাবাসে নাম নথি ভুক্ত করেছে তাদের ঘরে ফেরার জন্য। যেহেতু প্লেনের সংখ্যা খুব কম যাত্রীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ক্লেমেন্ট কর্ম হীন হয়েছে প্রায় তিন মাস হল। এখন তার অল্প টাকা অবশিষ্ট আছে তাই দিয়ে সে দিন চালাচ্ছে। ইউ এ ইতে কোভিড আক্রান্ত রোগী পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে এবং ৩০০র বেশী লোক মারা গেছে। আরবের শপিং মলের মালিক মানবিকতার ডাকে সাড়া দিয়ে সহানুভূতি দেখিয়েছেন এবং তাকে বিনা ভাড়ায় তার বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। মোটা টাকা তাকে দিতে হয় কোচিতে আসার জন্য বিশেষ প্লেনের টিকিট ভাড়া বাবদ। এখন তার ওয়ালেট প্রায় ফাঁকা। ''আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে কি করব?'' ক্লেমেন্টের মন বিলাপ করে উঠল। ''কোন ব্যাংক ব্যালান্স নেই পরিবার কিভাবে চলবে? যেহেতু লক ডাউন কেরালার অর্থনীতিকে ডুবিয়ে দিয়েছে সেখানে একজন সেলসম্যানের চাকরী পাওয়ারও কোন সুযোগ থাকবে না।'' সমাধানহীন দুর্ভাবনা গুলো তাকে একদম হতাশ করে দেয়। ইতিমধ্যে মাঝ রাত হয়ে গেছে ঘুম তাকে আলিঙ্গন করতে ভয় পাচ্ছে। ক্লেমেন্ট একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিল। যেহেতু লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতি দিনই তাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হত।

শনিবার এল এবং ক্লেমেন্ট সময়ের অনেক আগেই দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল। এয়ারপোর্টে অ্যান্টিবডি টেস্ট হয় এবং ক্লেমেন্ট নেগেটিভ সার্টিফিকেট পায়। এই সার্টিফিকেট তার কেরালা এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর জন্য আবশ্যক। প্লেনটা যখন কোচিতে নামল এবং কোভিড -১৯ সম্পর্কিত নিয়ম কানুন সম্পন্ন হল ক্লেমেন্ট তার স্ত্রীকে ফোন করে, ''হ্যালো মারলিন, প্লেন কোচিতে নেমেছে। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ৬টার মধ্যে বাড়ি আসছি।''

''এর মধ্যে পৌঁছে গেছো? আমরা সবাই তোমাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।'' এসো তাড়াতাড়ি প্রিয়তম।

ফোনটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শাশুড়ি বললেন, ''আমার আদরের খোকা ক্লেমেন্ট তোমাদের বাবা এখন সংকট জনক অবস্থায় আছেন। তার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় যদিও তিনি ইনহেলার নিচ্ছেন এবং ওষুধ খাচ্ছেন। আদরের খোকা, তুমি কি কোয়ারেন্টাইনের সময়টা কোন হোটেলে থাকবে যাতে তোমার বাবার বিপদজনক কিছু না হয়?''

''মা, আমার কোন সমস্যা নেই, নেগেটিভ সার্টিফিকেট আমার আছে। সাবধানতা হিসেবে বাড়িতে আলাদা থাকাই যথেষ্ট।'' ক্লেমেন্ট উত্তর দেয়।

''তবু তুমি হোটেলের ঘরে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলে ভাল হয় না কি? মাত্র ১৪ টা দিন।'' মা বলতে থাকলেন।

নিজের মায়ের মুখ থেকে এ কথা শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উত্তর দেয়, ''ঠিক আছে — মা''।

চোখের জল বাধা না মেনে তার গাল বেয়ে নামে। তাকে তার বাড়িতেই ঢুকতে বারণ করা হচ্ছে, যা সে নিজের টাকায় বানিয়ে ছিল। গত কুড়ি বছর ধরে সে তার পরিবারের কল্যাণের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। আর এগোতে না পেরে বাইরে বেরোনোর দরজার কাছে একটা চেয়ারে সে বসে পড়ে। আমি এখন কি করব? সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে। ''হোটেল কোয়ারেনটাইনে থাকার মত পর্যাপ্ত টাকা তার কাছে নেই। ১৪ দিন থাকার জন্য তারা বড় অংকের টাকা নেবে। সরকারী স্তরে প্রবাসীদের নিখরচায় কোয়ারেনটাইন থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। কোথায় যাব এখন?''

সে চিৎকার করে কাঁদতে চেয়েছিল। অন্যান্য যাত্রীরা একে একে বাইরে চলে গেল।

''ক্লেমেন্ট স্যার, আমাকে চিনতে পারছেন? আপনি কাঁদছেন কেন স্যার?''

বছর ৩৫ এর এক যুবক তার কাছে আসে এবং বলে, ''স্যার, আমি কৃষ্ণান, আপনার ছাত্র। আমাকে বলুন স্যার আপনি কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে? আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব যাই ঘটুক না কেন। আপনার সাহায্য যদি না পেতাম আজ আমি এখানে পৌঁছাতাম না। আমি দশম শ্রেণীর সরকারী পরীক্ষায় ফেল করেছিলাম এবং আপনার কাছে অংকের পাঠ নিয়ে আমি দ্বিতীয় বারে পাশ করি। যার জন্য আমার উচ্চতর শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। এখন শারজায় আমি একটা সরকারী কলেজে ইংরেজী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক। যেহেতু লক ডাউন চলছে সে জন্য কলেজ এখন বন্ধ, আমি বাড়ি যাচ্ছি। আপনার কি সাহায্য প্রয়োজন বলুন স্যার?''

''আদরের ছাত্র কৃষ্ণান। আমার খুব ভাল লাগছে যে তুমি আমাকে মনে রেখেছো। আমার ও তোমাকে মনে পড়ে। আমি কাঁদছিলাম এইজন্য যে এখন আমার যাবার কোন জায়গা নেই।'' ক্লেমেন্ট কেঁদে ফেলে এবং চোখের জল নামে। তারপর সে মা ফোনে যা বলেছেন তা বলে।

''কোন চিন্তা করবেন না স্যার, অনুগ্রহ করে আমার সংগে চলুন। আমি একটা বড় বাড়ি নিয়েছি সেখানে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের বাড়িতে দু সপ্তাহ থাকলে আমার স্ত্রী খুব খুশীই হবে। আমরা একজন পরিচারিকা পেয়েছি যে আপনার ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবে। সেখানে টিভি এবং বিনোদনের অন্যান্য উপকরণ আছে। আপনি সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। আপনি আমার জন্য যা করেছিলেন ঈশ্বর আমাকে তার প্রতিদান দেবার সুযোগ করে দিলেন। আমার বাড়ি এখান থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে। চলুন, আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে যাই।''

''ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবেন আদরের কৃষ্ণান! তুমি আজ যা করলে তার তুলনায় তোমার জন্য আমি যা করেছি তা নগণ্য। আমি তোমাদের ক্লাস নিতাম এবং আরও অনেকের। এবং তার জন্য আমি টাকা নিতাম। এখন দেখো আমার সারা জীবন পরিবারের জন্য কাজ করে প্রতিদানে আমি কি পেলাম ---'' তিনি ফোঁপাতে শুরু করলেন।

''এতে মন খারাপ করবেন না স্যার। আপনার মা এইভাবে যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তা ডাক্তারি শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত। অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে।'' কৃষ্ণান তাকে সান্ত্বনা দিলেন। ক্লেমেন্ট এইভাবে কৃষ্ণানের সঙ্গে তার বাড়ি গেলেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের অদৃষ্ট
Fate of Migrant Labourers

ইমরান জিজ্ঞাসা করে, ''কাঁদছিস কেন আমিনুল? কি হয়েছে?''

''আমার বউটা শয্যাশায়ী, খুব জ্বর আর মাথাব্যথা। এইমাত্র সে ফোন করেছিল। আমার সন্দেহ হচ্ছে তার কোভিড হতে পারে। আমাদের অনেক প্রতিবেশী হাসপাতালে এবং কয়েকজন ইতিমধ্যে মারা গেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার মত আমার বাড়ীতে কেউ নেই। সে হাঁপানি রোগী এবং অনেক বছর ধরে ইনহেলার নেয়। তুই জানিস আমাদের গ্রামে বা কাছাকাছি ছোট শহরে কোন হাসপাতাল নেই। আমি যে কি করব? আমার আত্মীয় স্বজনেরা দূরে কলকাতায় থাকে।'' আমিনুল ফুঁপিতে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

তার ফোঁপানির শব্দ শুনে ঘরের অন্য সঙ্গীরা শাকিব এবং তারিক তাকে সান্ত্বনা দিতে কাছে আসে।

''কিছু হবে না রে তোর বউয়ের, আমিনুল। আল্লা তাকে নিরাপদে রাখবেন। সে জানে যে তুই এখন সেখানে যেতে পারবি না এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবি না'' ইমরান বলে।

''যেহেতু এখানে লকডাউন এবং আমাদের এখানে কোন কাজ হয় নি আমি বাড়িতে যথেষ্ট টাকা পাঠাতে পারি নি। আমরা চারজন এখানে আবাসন নির্মাণকারী অর্জুন সাবের দয়ায় বাস করছি। তিনি বিনা পয়সায় আমাদের খাবার দিচ্ছেন, বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন। আমি কিভাবে বাড়িতে পাঠানোর জন্য কিছু টাকা তার কাছে চাইব?'' কলকাতায় কোন কোন প্রতিবেশী হয়ত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে যদি তাদের খরচ দেওয়া হয়। কিন্তু ---কি যে করি? আমিনুল কেঁদে উঠল। অঝোরে নদীর জল ধারার মত চোখের জল ফেলতে লাগল।

''তুই কেন অর্জুন সাবয়ের কাছে যাচ্ছিস না? তাকে তোর দুঃখের কথা বল আমিনুল।'' শাকিব পরামর্শ দেয়।

''ঠিক, তিনি আমাদের বড়ই কাছের মানুষ এবং যখনই প্রয়োজন হয়েছে সাহায্য করেছেন'' তারিক সমর্থন করে।

''ঠিক আছে, আমি অর্জুন সাবের সঙ্গে এখনই দেখা করব'' আমিনুল উত্তর দেয় এবং এক কিলোমিটার দূরে সোজা অর্জুনের বাড়িতে চলে যায়। বাইরে প্রচন্ড গরম, আর্দ্রতা অনেক বেশি, কোন বাতাস নেই। আমিনুল ভিতরে এবং বাইরে জ্বলন অনুভব করে।

অর্জুন একই সংগে স্থপতি এবং নির্মাতা। কোচিতে তার ছোট পরিবারে স্ত্রী এবং দুটি সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। সন্তানরা স্কুলে পড়ে। এম টেক করে ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে তিনি আবাসন নির্মাণকে জীবিকা হিসেবে নেন। যেহেতু বেকারত্ব কেরালাতে খুব বেশী তিনি কোন সংস্থাতে নিয়োগ পান নি। সেই কারণে তিনি নিজে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি পাঁচ ছয় কাঠা জমি কেনেন এবং শহরের বাসিন্দাদের জন্য বাড়ি তৈরী করেন। একটা সময় ছিল যখন তার সংস্থায় কুড়ি জনের বেশী শ্রমিক একই সংগে চার পাঁচ জায়গায় কাজ করত। বেশীর ভাগ শ্রমিকই ছিল ভারতের উত্তরের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা এবং ইউ পি র। যেহেতু লকডাউন ২০২০ সালে শুরু হয়েছিল তিনি নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন। উল্লিখিত এই চারজন ছাড়া আর সব শ্রমিকেরা তাদের বাড়ি ফিরে যায়। মনিবের সব শ্রমিকদের মধ্যে প্রিয় ছিল আমিনুল। অর্জুন তাকে নিজের ভাই বলে মনে করতেন। ইমরান, সাকিব এবং তারিক আমিনুলের প্রতিবেশী ছিল এবং কাজের খোঁজে পাঁচ বছর আগে তারা একসঙ্গে কেরালা এসেছিল। সৌভাগ্যক্রমে কেরালায় আসার মুহূর্ত থেকে অর্জুন তার নির্মাণ ব্যবসায়ে তাদের নিযুক্ত করেন। তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন জায়গার নির্মাণ কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। তারা ছিল খুব সৎ এবং মনিবের অনুগত। এমনকি অর্জুন সেই কাজের জায়গায় যদি না দেখভাল করতে যেতেন তারা মনিবকে আশ্বস্ত করত যে সমস্যা ছাড়াই কাজ চলছে। ২০২০ সালের এপ্রিলে যখন কুড়ি জন শ্রমিক ছিল তাদের ঘর ভাড়া দিয়ে খেতে দিতে হত। যেহেতু লকডাউন চলতেই থাকল তাদের কোন মজুরী দেওয়া গেল না, একজন একজন করে তারা দেশে ফিরে গেল। যখন লকডাউন উঠে যেতে শুরু করে এবং নির্মাণ কাজ পুনরায় শুরু হয় অল্প কয়েকজন কাজে যোগ দেয়। কিন্তু যখন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হল লকডাউনের অঙ্গ হিসেবে নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে হয়েছিল। চারজন ছাড়া

তারা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। চারজনকে অর্জুন প্রতিদিন ৫০০টাকা করে দিতেন। সেই টাকা তারা তাদের বাড়িতে সংসার চালানোর জন্য পাঠাত। অর্জুনকে একটা মোটা টাকা যোগাড় করতে হত যা দিয়ে তাকে প্রতি মাসে ব্যাঙ্কের ঋণ, শ্রমিকদের দিন গুজরানের খরচ এবং নিজের পরিবারের জন্য খরচ সামাল দিতে হত। এতদিন যে উদ্বৃত্ত অর্থ সে উপার্জন করেছিল সব এখন খুব কাজে লাগে।

''আমাদের নিজেদের বাড়িতে সশরীরে উপস্থিত থাকাটা যে কত জরুরী সেটা কেউ সেখানে অসুস্থ হলে মালুম হয়।'' ইমরান বলেছিল।

''আমার মা কোভিডে মারা যেত না যদি সেই সময় তার লক্ষণ গুলো যখন দেখা গিয়েছিল আমি সেখানে থাকতাম,'' সাকিব উত্তর দেয়।

''একই ভাবে আমি আমার বাবাকে হারাতাম না যদি আমি ঠিক সময় সেখানে পৌঁছাতে পারতাম'', তারিক বলে।

''আমাদের মত লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভাগ্যের ফেরে দুঃসহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছি। দেড় বছর ধরে আমাদের মনে কোন শান্তি নেই,'' ইমরান বলে।

''লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের কাজ হারিয়েছে, যখন দলবদ্ধ হয়ে নিজ রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে হাজার হাজার পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছে, অনেকে আত্মহত্যা করেছে যখন তারা পরিবারকে সাহায্য করতে বিফল হয়েছে'', তারিক সংযোজন করে।

এদিকে আমিনুল অর্জুনের বাড়ি পৌঁছায়। সে দরদর করে ঘামছিল এবং হাঁপাচ্ছিল যেহেতু সে দ্রুত হেঁটেছে। অর্জুন আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা নিয়ে ভাবছিলেন সম্প্রতি যার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে।

''এই আমিনুল, কি খবর?'' অর্জুন জিজ্ঞাসা করে।

''আমার বউটা খুব অসুস্থ প্রিয় সাব। সে আমাকে আজ সকালে ফোন করে জানায় যে তার খুব জ্বর, মাথাব্যথা আর কাশি হয়েছে। সে প্রায় বিছানায় শোয়া এবং সেখানে তাকে দেখার কেউ নেই। আপনি জানেন যে আমাদের চারপাশে কোন আত্মীয় স্বজন নেই এবং পুরো গ্রামটা কোভিডে আক্রান্ত। আমাদের বেশীর ভাগ প্রতিবেশী কোভিড রোগী এবং অনেকেই শহরের হাসপাতালে। কিছুজন ইতিমধ্যে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আমি যে কি করব সাব?'' আমিনুল কেঁদে উঠে।

''আমিনুল, তুমি কি এখন বাড়ি যেতে চাও?'' অর্জুন জিজ্ঞাসা করেন।

''হ্যাঁ সাব। আমি কোন ভাবে সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারলে হয়ত তাকে বাঁচানো যাবে,'' আমিনুল উত্তর দেয়।

''তাহলে তুমি প্লেনে চলে যাও আজই'', অর্জুন বলেন।

''কিন্তু আমার কাছে ত টিকিট কেনার মত টাকা নেই, সাব। আমি ট্রেনে যাব'', আমিনুল উত্তর দেয়।

''টাকার জন্য ভেবো না। আমি তোমার যাবার ভাড়া দেব। তুমি আমার ভাইয়ের মত। তুমি পাঁচ বছর ধরে আমার এখানে কাজ করছ। এটা আমার কর্তব্য ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও আমি ইদানীং অর্থনৈতিক সঙ্কটে আছি তোমার জরুরী প্রয়োজনে সাহায্য না করে আমি থাকি কি করে? এটা আমার দায়িত্ব। তুমি তোমার ঘরে গিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নাও। আমি তোমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাব। প্রতিদিন কলকাতা যাবার প্লেন ছাড়ে এবং তুমি বিকেলের প্লেনে যেতে পারবে'', অর্জুন বলেন।

''অনেক অনেক ধন্যবাদ সাব। আমার আপনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত করবেন, সাব।'' আমিনুল উত্তর দেয় এবং হাত জোড় করে। সে দ্রুত তার ঘরে চলে আসে। তার দেহ মনকে শীতল করতে বৃষ্টি নামে। পাখীরা আনন্দে কিচির মিচির করে ওঠে যেন তারা শুনছিল অর্জুন এবং আমিনুলের কথা।

ঘরে পৌঁছে আমিনুল অন্যদের প্লেনে কলকাতা যাওয়ার সুখবরটা বলে। তার বন্ধুরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। এবং একথা ভেবে উত্তেজিত হয় যে তাদের মনিব একজনের প্রাণরক্ষকের কাজ করছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে অর্জুন তার গাড়িতে সেখানে পৌঁছে যান এবং আমিনুলকে কোচি এয়ারপোর্টে চল্লিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দেন। গাড়ী থেকে নামার আগে অর্জুন একটা ছোট ব্যাগ আমিনুলকে দেন এবং তাকে বলেন, ''ব্যাগে এক লক্ষ টাকা আছে। তোমার টিকিট এবং বউয়ের চিকিৎসার জন্য। বাড়ি পৌঁছে তাকে কলকাতায় ভাল কোন হাসপাতালে নিয়ে যেও এবং সম্ভাব্য কোভিডের লক্ষণের চিকিৎসা কোরো। যেদিন সে সুস্থ হবে এবং চলা ফেরা করতে পারবে তুমি কোচি ফিরে এসো তাকে এবং তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। আমি একটা ঘর ভাড়া তোমার জন্য নিয়ে রাখব আমার বাড়ির কাছাকাছি। তুমি যতদিন ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারবে। করোনার দিন গুলো কয়েক মাসের মধ্যে চলে যাবে এবং তুমি তোমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবে। তোমার বাচ্চারা আশেপাশের সরকারী স্কুলে পড়াশোনা করতে পারবে।''

আনন্দে আমিনুলের চোখে জলের ধারা নামে। ''আপনি আমার ঈশ্বর, প্রিয় সাব। আপনি আমার ওপর যে এই ভালবাসা এবং উদারতা দেখালেন তা আমি কখনোই ভুলব না। আমি আমৃত্যু আপনার যে কোন কাজের জন্য তৈরী থাকব।" কাঁপা কণ্ঠে সে উত্তর দেয় এবং গাড়ি থেকে নামে। সাবকে বিদায় জানায় এবং প্রবেশ দ্বার দিয়ে এয়ার পোর্টের ভিতরে ঢোকে।

তিন ঘণ্টা যাত্রা করে আমিনুল কলকাতা এয়ারপোর্টে নামে। তারপর সে তার গ্রাম পর্যন্ত পঞ্চাশ কিলোমিটার যেতে একটা ট্যাক্সি নেয়। তার ঘরে ফেরা তার বউ এবং ছেলেমেয়েদের কাছে ছিল অভাবিত চমক কারণ সে প্রত্যাগমন সম্পর্কে তাদের কিছু জানায় নি। তার বউ আবিদার অবস্থা ছিল সংকটজনক। সেই ট্যাক্সিতেই সে বউ এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতা চলে আসে। সরকারী এক হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দেয় এবং চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়। আর টি-পি সি আর টেস্ট দেখায় যে সে পজিটিভ এবং করোনা সংক্রমণ তার শরীরে হয়েছে। কোভিডের প্রাথমিক ষ্টেজ। যদিও সে হাঁপানির রোগী তার ফুসফুস বেশী সংক্রমিত হয় নি। সপ্তাহ খানেক হাসপাতালে থাকার পর সে পুরোপুরি সুস্থ হয় এবং সেখান থেকে ছাড়া পায়। বাড়ি এলে আমিনুল কেরালা ফিরে যাবার প্রস্তুতি নেয়। সে দুটো ছাগল এবং এক ডজন মুরগী কিনেছিল তারা তার বাড়িতে বড় হচ্ছিল সে সেগুলো বিক্রি করে দেয়। তার একমাত্র ভাই কলকাতায় বাস করত সে তার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে বাড়িটাকে মাঝে মাঝে দেখা শোনা করতে বলে।

এক সোমবার সকালে আমিনুল এবং তার পরিবার কোচির প্লেন ধরে। অর্জুন তাদের নেবার জন্য এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মনিবের বাড়ির কাছাকাছি তাদের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। সৌভাগ্যক্রমে অর্জুন বাড়ি তৈরীর কাজ ফিরে পেয়েছিলেন। সেই জায়গাটি কর্পোরেশনের নিরাপদ এলাকা (Green Zone) বলে চিহ্নিত ছিল। আমিনুল এবং তার সহকর্মীরা সেখানে কাজ শুরু করে এবং দৈনিক ১০০০ টাকা মজুরী পায়।

মনুষ্যত্ব বর্জিত সমাজে যেখানে মনিবেরা শ্রমিকদের প্রতি ছিটেফোঁটা ভালবাসা এবং মহানুভবতা দেখান না অর্জুন সেখানে নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করে - ধ্রুবতারার মত পথ প্রদর্শক দৃষ্টান্ত হন সকলের কাছে।

প্রকৃতি শেখায়

Nature Teaches

মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্য করে বলেনঃ ''আমাদের আজকের সভার অন্যতম আলোচ্য বিষয় গান্ধী স্কোয়ারের কাছে মিউনিসিপ্যালিটির যে জমি আছে সেখানে শপিং মল তৈরি। সেই জায়গাটা অনেক বছর ধরে পতিত হয়ে পড়ে আছে। আমরা যদি সেখানে একটা শপিং মল নির্মাণ করতে পারি আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির অতিরিক্ত আয় হবে''।

''কিন্তু সেখানে রাস্তার ধারে সামনেই একটা বড় বট গাছ আছে এবং এটা বাস থামার জায়গা। যাত্রীরা তাদের বাস ধরার আগে সেখানে রোদের তীব্র তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছায়ায় অপেক্ষা করে। জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠবে যদি আমরা গাছটা কাটি'', কাউন্সিলর জয়রাম বলেন।

''এই এলাকায় এটাই এক মাত্র গাছ পড়ে আছে। উন্নয়নের নামে রাস্তার ধারের প্রায় সব গাছই আমরা কেটে ফেলেছি। ওই গাছ গুলো স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে যে রাজারা রাজত্ব করতেন তারা বসিয়েছিলেন। তারা আমাদের মত ছিলেন না। তারা ছিলেন প্রকৃতি প্রেমী। তারা আমাদের মনুষ্য জাতির এবং অন্যান্য প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য গাছের এবং উদ্ভিদের গুরুত্ব জানতেন। এই শহরে ওই বট গাছটা শত শত পাখীর আবাস। শুধু মাত্র পাখী নয় কাঠ বিড়ালী, মাছি, মৌমাছি, বোলতা, গিরগিটি, মাকড়সা, পিঁপড়ে এবং আরও অনেক প্রাণী এই গাছটার জন্য টিকে আছে। অন্যান্য জীব, উদ্ভিদ, বৃক্ষ এবং আর সব প্রাণী যারা পৃথিবীতে আছে তাদের কি আমাদের মানুষের মত বাঁচার সম অধিকার নেই?'' কাউন্সিলর কৃষ্ণান উষ্মা প্রকাশ করলেন।

''কিভাবে তুমি অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদকে মানুষের সংগে এক আসনে বসাবে? এই সব কি মানুষের জন্য সৃষ্টি হয় নি? আমাদের মানুষের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া

উচিত। এমন কি সেই গাছ যদি কাটাও হয় পাখীরা এবং আর সব প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারবে। শহরতলিতে গাছ আছে এবং তারা সেখানে বাস করবে। আমার মতে, শপিং মল তৈরী হওয়া উচিত। এবং এতে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাড়বে। যখনি আমরা কাউন্সিলরেরা ফান্ড গঠনের জন্য অনুরোধ করি উত্তর সব সময়ই না বাচক হয়। দোকান ঘর ভাড়া দিয়ে আমরা প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করতে পারব," কাউন্সিলর যোশেফ বলেন।

''আমি কাউন্সিলর যোশেফের মতকে পূর্ণ সমর্থন করি। আগে আমাদের মানুষদের কথা ভাবা যাক্ তারপর আমরা অন্য প্রাণী এবং গাছপালার কথা ভাবব।" কাউন্সিলর আশ্রফ বলেন।

''আমাদের সহমত হওয়া উচিত" চেয়ারম্যান ইউসুফ বলেন। ''যারা শপিং মল গঠনের পক্ষে তারা হাত তুলুন"।

তিরিশ জন কাউন্সিলরের মধ্যে পঁচিশ জন শপিং মল নির্মাণের পক্ষে ভোট দিলেন। এইভাবে স্থির হল যে শপিং মল তিনতলা বিশিষ্ট হবে। এর জন্য দরপত্র ডাকা উচিত। সবচেয়ে কম দরদাতাকে কাজটা দেওয়া হবে এবং নির্মাণ দু বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

কাউন্সিলর জয়রাম সাবধান করলেন, ''আমার মনে হয় না লোকজনের বিরোধ ছাড়া আমরা গাছ কাটতে পারব। আমাদের শহরে কিছু প্রকৃতি প্রেমী আছেন যারা প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা সেই গাছের নীচে জড়ো হয়।"

''আমরা গাছ কাটার সময় পুলিসের সাহায্য নেব" সভাপতি বললেন। এইভাবে সভা সমাপ্ত হল।

জানালার ফলকে বসে একটা কাক কাউন্সিলরদের আলোচনা শোনে। সে প্রায় প্রতিটা সভায় সেখানে যেত ফেলে দেওয়া খাবারের জন্য। গাছ কাটার সিদ্ধান্ত তার বুকে শেল বিঁধল। সেদিন সভা শেষের পর সে বট গাছে গিয়ে বসল উদবৃত্ত খাবারের জন্য অপেক্ষা না করে। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। সব কাক এবং অন্য পাখীরা ফিরে এসেছে বট গাছের শাখায় ঘুমোবে বলে। কাকটা যতদূর সম্ভব জোরে কেঁদে উঠলঃ ''প্রিয় বন্ধুরা, আমি সাবধান করে দেবার মত খবর নিয়ে এসেছি। আমি কাউন্সিলের সভা ঘরে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলরদের বক্তব্য শুনছিলাম। তারা স্থির করেছেন আমাদের আশ্রয় স্থল তারা ধ্বংস করবে, গাছ কেটে শপিং মল হবে এখানে।"

তখন সব কাক, ময়না, কোকিল, বুলবুল, হাড়িচাচা, ফুলিঝুরি, ফিংঙে, কাঠঠোকরা, পেঁচা এবং অন্য সব পাখীরা বিশাল গাছের অসংখ্য শাখায় যারা বিশ্রাম নিচ্ছিল ঘোষক কাকের কাছে এল। কাকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তখন বলেঃ ''এটা এই শহরে আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। মানুষেরা আমাদের সব বাসা নষ্ট করে দিয়েছে আমাদের অস্তিত্বের জন্য একটুও না ভেবে। এই আশ্রয়টা যদি আমরা হারাই তাহলে আমরা ঘুমোব কোথায়? এই বট গাছটা শুধুমাত্র আমাদের বাড়ি নয় আমাদের অন্নদাতাও বটে। আমরা এর শাখায় শাখায় হয়ে থাকা ফল খেয়ে বেঁচে আছি। এই গাছ কেটে ফেলা মানে আমাদের হত্যা করা। আমরা কখনো এই কাজ সমর্থন করব না।''

বয়োজ্যেষ্ঠ ময়না তাকে সমর্থন করে বলে, ''মানুষের এই গাছ কাটার কি অধিকার আছে? এই পৃথিবীটা তাদের ঠাকুরদার সম্পত্তি নয়। আমরা কখনো তাদের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করি না এবং তাদের উৎখাত করি না। তাহলে তারা কেন আমাদের ঘর ভাঙবে এবং আমাদের খাবার এবং আশ্রয় হারা করবে?''

একটা কাঠ বিড়ালী পাখীদের কথা গুলো শুনে বলে, ''আমি তোমাদের বক্তব্য সমর্থন করি প্রিয় বন্ধুরা। আমরা মানুষের গাছ কাটার পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতে পারি দলবদ্ধ হয়ে।''

বয়োজ্যেষ্ঠ কাক উচ্চৈঃ স্বরে ঘোষণা করলঃ ''সুতরাং আমরা সবাই একসঙ্গে লড়াই করব মানুষের বিরুদ্ধে যদি তারা গাছ কাটতে আসে। আমাদের বার্তা বাহক কাক কাউন্সিলের অ্যাজেন্ডার খবর প্রতিদিন সংগ্রহ করবে এবং এইভাবে আমাদের প্রয়োজন মত সাবধান করবে। আমাদের মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে যে অমানব প্রাণীরা মানুষের চেয়ে কোন অংশে দুর্বল এবং মুল্যহীন নয় বরং সবল এবং শক্তিমান।'' সভা সাঙ্গ হলো এবং যে যার মত পাখীরা এবং অন্য প্রাণীরা ঘুমোতে গেল।

শপিং মল নির্মাণের দরপত্র চূড়ান্ত হয় এবং কাজটা একটা কোম্পানিকে দেওয়া হয়। কোম্পানির নাম ভিশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। একটা সোমবার সেই কোম্পানির দুজন কাঠুরে আসে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি কুঠার, গাছ কাটার শক্তিশালী যন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে। বার্তা বাহক কাক ইতিমধ্যে সব পাখী এবং অন্য সব প্রাণীদের জানিয়ে দিয়েছিল কনস্ট্রাকশণ কোম্পানির গতিবিধি। সুতরাং কোন পাখী এবং অন্য পশু খাবারের সন্ধানে সেদিন অন্যত্র চলে যায় নি।

বৃক্ষছেদনকারীদের গাছের কাছে দেখে একদল প্রকৃতি প্রেমী যারা গাছটির বিয়োগান্তক পরিণতি অনুমান করেছিলেন তারা তাদের ঘিরে ধরলেন এবং তাদের নেতা জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমরা কি করতে যাচ্ছ?''

''আমাদের বলা হয়েছে এই গাছটা কাটতে'', বৃক্ষছেদনকারীরা উত্তর দেয়।

''কে তোমাকে বলেছে?'' প্রতিবাদী নেতা জিজ্ঞাসা করেন।

আমাদের কোম্পানির ম্যানেজার। কোম্পানিটি এখানে শপিং মল তৈরীর বরাত পেয়েছে।

না, আমরা তোমাদের এই গাছ স্পর্শ করতে দেব না। এটা হাজার হাজার যাত্রীর প্রতীক্ষালয় এবং শত শত পাখীর এবং অন্য সব প্রাণীর বাসস্থান। তোমাদের ম্যানেজারকে বলো আমরা তোমাদের এই কাজ করতে দেব না।

তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ ছেদনকারীরা ম্যানেজারকে ফোন করে এবং দশ মিনিটের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং শপিং মল নির্মাণের ম্যানেজার রক্ষক পুলিশের দল নিয়ে সেখানে চলে আসে।

চেয়ারম্যান তখন বিক্ষোভকারীদের বললেন, ''মিউনিসিপ্যালিটি বট গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এখানে একটা শপিং মল তৈরী করবে। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আমরা এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'' বিক্ষোভকারীদের নেতা উত্তর দেন, ''শত শত যাত্রীর এটা বিশ্রামের জায়গা। প্রতিদিন তারা এখান থেকে বাস ধরেন। আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি এই গাছটাকে না কাটতে। আপনারা যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য এই অঞ্চলে কোন শেড তৈরী করেন নি যদিও জনসাধারণ বহু বছর ধরে এই আবেদন করে আসছে। শত শত পাখী এবং অন্যান্য প্রাণী খাবার এবং আশ্রয়ের জন্য এই গাছের ওপর নির্ভর করে। তাদের যাবার অন্য কোন জায়গা নেই। আপনারা এই মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধারের বহু গাছ কেটে ফেলেছেন। ভাবতে পারেন কত মহৎ এবং নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মোৎসর্গ করে চলেছে এই গাছ গুলো! আপনাদের প্রশাসকদের প্রকৃতির এই অবদান পড়ার মত হৃদয় নেই। আমরা আপনাদের এই গাছ কাটতে দেব না।'' একথা বলে সে এবং তার অনুগামীরা জনা কুড়ি মানুষ সেই গাছের তলায় শুয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান সাবইনস্পেক্টরকে তাদের সরিয়ে দিতে বলেন।

সাব ইনসপেক্টর বিক্ষোভকারীদের বলেন, ''আপনারা যদি সরে না যান আমরা আপনাদের গ্রেফতার করব এবং থানায় নিয়ে যাব।''

''আমরা সরব না।'' বিক্ষোভকারীদের নেতা বললেন। তারপর সাব ইনসপেক্টরকে কনস্টেবলদের আদেশ দিলেন তাদের গ্রেফতার করতে। কনস্টেবলেরা বিক্ষোভকারীদের একে একে পুলিস জিপে তুলল।

এখন আমাদের পালা, ''কাকদের নেতা সব পাখীদের ঈশারা করল। সব কাক, ময়না এবং অন্য পাখীরা সাব ইনসপেক্টর, পুলিস কনস্টেবল, চেয়ারম্যান, ম্যানেজার এবং বৃক্ষছেদনকারীদের মাথা ঠোকরাতে শুরু করল। সাব ইনসপেক্টর পাখীদের বন্দুক দিয়ে গুলি করতে আদেশ দিলেন। বন্দুক নিক্ষেপ হল ওপর দিকে এবং একটা গিয়ে আঘাত করল গাছের একটা শাখায় বোলতার বাসায়। হাজার হাজার বোলতা ক্রোধে নেমে আক্রমণ করল অনিষ্টকারীদের। পুলিস, চেয়ারম্যান, এবং ম্যানেজার তাদের গাড়ীতে উঠে গেলেন এবং পালিয়ে তাদের জীবন বাঁচালেন। তবু বোলতারা তাদের ধাওয়া করল। বৃক্ষ ছেদনকারীরা কাছাকাছি একটা হোটেলে পালিয়ে গেল। প্রতিবাদকারীরাও অন্য একটা হোটেলে পালিয়ে গেল। পাখীরা তাদের শাখায় ফিরে এল। কয়েক মিনিট পরে বোলতারাও গাছে ফেরত এল। পাখীদের কিচির মিচির, কলকাকলি এবং গাছ থেকে পাখীদের এই জাতীয় সব আনন্দজনক ধ্বনি যা দিয়ে তারা তাদের বিজয়ের উদযাপন করছিল যে কেউ বাতাসে কান পাতলে তা শুনতে পাবে। পাখীদের সমবেত গানে সংগত দিয়েছিল বোলতা এবং মৌমাছিদের গুনগুন। কাঠবিড়ালি এবং ঝি ঝি পোকারাও তীক্ষ্ণ স্বরে গানে অংশ গ্রহণ করে। মনে হয়েছিল যেন স্বর্গীয় ঐকতান।

পর দিন জরুরী সভা হয়েছিল মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের। চেয়ারম্যান কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্য করে বলেনঃ ''যদিও আমরা ঠিক করেছিলাম শপিং মল নির্মাণের। প্রকৃতি আমাদের গাছ কাটার অনুমোদন দেয় নি। আমাদের এই শিক্ষা হল যে অমানব প্রজাতির প্রতি আমাদের সদয় হওয়া উচিত। কারণ এই পৃথিবীটা তাদেরও। এই মিউনিসিপ্যালিটি প্রকৃতির যে ক্ষতি করেছে বৃক্ষ ছেদনের ক্ষতি পূরণ হিসেবে আসুন আমরা যত বেশী সংখ্যক পারি রাস্তার ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ করি। আমার মনে হয় গতকাল যা ঘটেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই বিষয়ে সকলে এক মত হব।'' সব কাউন্সিলররাই চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে সহমত হলেন।

সীতার সংকল্প

Seetha's Resolve

''সীতা আর কতদিন তুই একা থাকবি? এত বিয়ের প্রস্তাব এল এবং একটাতেও তুই মত দিলি না। ইতিমধ্যে তোর সাতাশ হয়ে গেছে। এখনও যদি বিলম্ব করিস তাহলে তুই স্বামী নাও পেতে পারিস। পুরুষেরা চায় তাদের স্ত্রীরা তাদের থেকে বয়সে ছোট হোক্ এবং এখানে বেশীর ভাগ যুবক তিরিশের আগেই বিয়ে করে নেয়। তুই আমাদের একমাত্র সন্তান এবং আমরা তোর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিতে চাই। দেখ্, তোর বাবা মায়ের শরীর বিশেষ ভাল না। যে কোন সময় কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। আমার কলেজের এক সহপাঠী গোপীর কাছ থেকে একটা নতুন প্রস্তাব এসেছে। তার ছেলে আনন্দ একটা সরকারী স্কুলে চাকরী করে। আমি আনন্দকে তার বাড়িতে দেখেছি। সে সুদর্শন, স্মার্ট এবং নম্র'', রবীন্দ্রন তার মেয়েকে বলেন।

''বাবা, আমি সরকারী স্থায়ী চাকরী পাওয়ার জন্য আমার বিয়েটা আপাতত পিছিয়ে দিতে চাইছি। কোন রকম সরকারী সাহায্য ছাড়া কলেজের অল্প বেতনে কি কিছু করা যায়? আজকালকার দিনে কোন পরিবারই স্বামী স্ত্রী দুজনের রোজগার ছাড়া চলে না। তার ওপর স্বামীর সংসারে বেরোজগেরে স্ত্রীর কোন মূল্যই থাকে না। শ্বশুর বাড়িতে তাকে একজন চাকর হিসেবে দেখা হয়। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে এবং আমার স্থায়ী সরকারী চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। সরকারী চাকরী মরূদ্যানসম হলেও এখনই যেহেতু সম্ভব হচ্ছে না তোমার প্রস্তাব মেনে নিলাম। বাবা, আমার জন্মকুন্ডলীতে বিশ্বাস নেই এবং তারা যদি আমার নক্ষত্র তার সংগে মেলাতে চায় তাহলে তাদের বোলো আমার তাকে বিয়ে করার কোন ইচ্ছা নেই'', সীতা উত্তর দেয়।

''সীতা, গোপী একদম আমার মত, আমাদের যেমন জ্যোতিষ এবং জন্মকুন্ডলীতে বিশ্বাস নেই তারও সেই রকম বিশ্বাস নেই। আমরা অনেক বার আলোচনা করেছি কিভাবে জন্মকুন্ডলীর নামে শোষণ করা হয়। সুতরাং সেই রকম কোন সমস্যা হবে

না। আরেকটা সুবিধে হল যে তারা কোন পণ নেবে না যেহেতু গোপী এই প্রথার বিপক্ষে। আমাদের যা কিছু তোর এবং তোর ভবিষ্যৎ পরিবারের জন্য। আর তুই ত জানিস যে তুই কলেজে পড়িয়ে যা রোজগার করেছিস তা ছাড়া আমাদের কোন ব্যাঙ্কে জমানো টাকা নেই। আমার সামান্য পেনশনের টাকায় সংসারটা চলে। তুই কল্পনা করতে পারিস একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক কত সামান্য টাকা পেনশন পান", রবীন্দ্রন বলেন।

সীতার মা লক্ষ্মী তখন বাধা দিয়ে বলেন, ''বাস্তবিক তোর বাবা যখন অবসর নেন তখন এককালীন বেশ কিছু টাকা প্রায় তিন লক্ষ টাকা পান। আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম যে তোর বিয়েতে সেটা খরচ করব। যেহেতু সেই সময়ে তুই বিয়ের কোন প্রস্তাবে রাজী হোস নি আমরা আমাদের বাড়ি তৈরীতে সেটা খরচ করে ফেলেছি। আমিও আনন্দকে দেখেছি যখন তোর বাবার সংগে তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তোর সংগে সবদিক থেকে মানাবে বলে আমার মনে হয়।"

''যদি তোমরা দুজনে আনন্দকে পছন্দ করে থাকো তাহলে বিয়ের প্রস্তাবের অঙ্গ হিসেবে তাকে আগামী রবিবার এখানে আসতে অনুরোধ করো", সীতা বলে।

পরবর্তী রবিবার আনন্দ তার বাবা মা এবং বিবাহিত বড় দিদির সংগে সীতার বাড়ি আসে। তারা সবাই সীতাকে পছন্দ করে কারণ সে ছিল খুব সুশ্রী চেহারার, স্মার্ট এবং আচার আচরণেও নম্র। একই ভাবে সীতা এবং তার বাবা মা আনন্দকে পছন্দ করেন যেহেতু আনন্দ ছিল সুদর্শন এবং সর্বাংশে সীতার সংগে মানানসই। বিয়ের দিন ঠিক হল এক মাস পর একটা রবিবারে।

সীতার এক প্রতিবেশী ছিল বেণু। সে ছিল তার সহপাঠী - তার সঙ্গে স্কুলে এবং বি.এ ক্লাসে পড়েছে। সে বি.এ ক্লাসে ফেল করে এবং পড়া ছেড়ে দেয়। তার বাবা মা ছিল শ্রমিক, কাছাকাছি এক এলাচের ক্ষেত্রে কাজ করত। বেণু যেহেতু সরকারী চাকরী পায় নি সে একটা অটো রিক্সা কেনে এবং সেই রোজগারে জীবন যাপন করে। তার সীতার প্রতি দুর্বলতা ছিল স্কুল জীবন থেকেই এবং তার এই মনোভাব সে লালন করত। বেণু সুদর্শন ছিল না এবং তার হীনমন্যতার কারণে সে সীতার কাছে তার প্রেম প্রকাশ করতে পারে নি। সে প্রস্তাব দিয়েছিল যে সে তাকে রোজ তার অটোরিক্সায় কলেজে নিয়ে যাবে। শহরের যেখানে সে পড়াতে যেত সেখানে যাবার জন্য ঘন ঘন বাস পাওয়া যেত না। সীতা তাই এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করে। শহরে যেতে কুড়ি মিনিট সময় লাগত।

যেহেতু বেণুর বাড়ি সীতার বাড়ির খুব কাছেই সে তার বাড়ির সব কিছু জানতে পারত। বেণু শোনে যে সীতার বিয়ের সম্বন্ধ দেখা চলছে। একদিন যখন তারা অটো রিক্সায় শহরে যায় বেণু পথে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সাহস সঞ্চয় করে বলে, ''সীতা এত বছর ধরে আমার মনের কোণে লুকিয়ে রাখা কথা আজ তোমাকে

বলতে চাই।"

''কি সেটা? আমাকে বলো বেণু" সীতা উত্তর দেয়।

''আমি তোমাকে ভালবাসি এবং তোমাকে বিয়ে করতে চাই", কাঁপা কণ্ঠে সে উত্তর দেয়।

''দুঃখিত, বেণু, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার বাবার বন্ধুর ছেলে আনন্দের সংগে। সে একটা সরকারী ঊচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক," সীতা বলে।

এই খবরটা বেণুর কাছে ছিল হৃদয় বিদারক। সে সীতাকে শিগগীরই হারাবে। সে তাকে এতটাই ভালবাসত যে তাকে ছাড়া বাঁচা সে ভাবতে পারে না। সে ভেবেছিল যে সীতা তাকে মনে মনে ভালবাসে তার নীরব প্রেমের মত। তারা এত বছর ধরে এত সহজ ভাবে কথা বলত যে সে ভেবেছিল সীতা তাকে ভালবাসে যদিও স্পষ্ট ভাবে তা প্রকাশিত ছিল না।

বেণু বলে, ''সীতা আমরা অনেক দিন ধরে পরস্পর পরস্পরকে জানি, আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি তোমাকে খুব ভালো রাখব। আমি যথেষ্ট ভাল রোজগার করি।"

''বেণু, আমরা সমান সমান নই। এটা সত্যি যে তুমি খুব ভাল লোক কিন্তু আমার বাবা মা আমাদের বিয়ে মানবেন না। দেখো, সরকারী চাকরী না হলেও আমি একজন শিক্ষিকা কিন্তু তোমার কি আছে? খুব দুঃখিত আমরা দুজনে কোন ভাবেই ভাল জুটি নই।"

''ঠিক আছে, আমি অনেক স্বপ্ন দেখে ফেলেছিলাম ---" একথা বলে বেণু অটো রিক্সার ইঞ্জিন চালু করে এবং শহরে চলে যায়। তারা আর কোন কথা বলে নি। রিক্সা কলেজের গেটে দাঁড়ায় এবং সে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায়। সীতা ভাড়া দিলে বেণু নেয় না তাকে খুব মন মরা মনে হয়, তাকে অগ্রাহ্য করে এমন কি মুখের দিকেও তাকায় না।

সীতাও মনের শান্তি হারিয়ে ফেলে। বেণু তার প্রতিবেশী হওয়াতে তার সংগে প্রতিদিন দেখা হবে। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে সে বাবা মাকে যা ঘটেছে সব বলে।

''তোমাকে বিয়ে করার কি যোগ্যতা তার আছে?" বাবা বলেন।

তার মা বেণুর সীতাকে বিয়ের প্রস্তাবে চিন্তিত হন।

পরদিন সকালে যথারীতি সীতা তার কলেজে যাবার জন্য তৈরী হয়। বেণুর অটোরিকশাকে এড়িয়ে যাবার জন্য সে আগে তৈরী হয় যাতে সে বাস ধরতে পারে। বাসটা তিরিশ মিনিট আগে শহরে যায়। সে রাস্তায় যখন গেল বেণু তার অটোরিক্সা নিয়ে সীতার খুব কাছে গিয়ে সীতার মুখে তরল কিছু ছোড়ে এবং পালিয়ে যায়। সেই বস্তুটা ছিল অ্যাসিড। সীতা জোরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি দৌড়ে আসে, ''আমাকে বাঁচাও।"

বাড়িতে পৌঁছে সে কাঁদে, ''বেণু আমার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়েছে। বাবা, আমার মুখে জল দাও, এবং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে চল।''

সীতার বাবা এবং মা একথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কাঁদতে কাঁদতে তারা এক বালতি জল আনেন এবং অবিরত একটা মগে করে তারা সীতার মুখের চারপাশে জল ঢালতে থাকেন। রবীন্দ্রন তক্ষুনি তার প্রতিবেশী যোশেফকে ফোন করেন। এবং সে তার গাড়ি নিয়ে আসে। সীতাকে শহরে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারেরা তৎক্ষণাৎ পোড়ার চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। তার মুখের ডান দিকের অংশ এবং ঘাড়ের কিছুটা অংশ গভীর ভাবে পুড়েছে। সৌভাগ্য ক্রমে অ্যাসিড তার চোখে, ঠোঁটে বা কানে পড়ে নি। জল দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার কারণে পোড়া জনিত ক্ষতের পরিমাণ অনেকাংশে কম হয়েছিল।

রবীন্দ্রন বিষয়টা পুলিশে জানায় এবং বেণু গ্রেফতার হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। বেণু তদন্তে সহযোগিতা করে এবং স্বীকার করে যে সে এই অপরাধ করেছে। সে পুলিশকে বলে যে সীতা যাতে বিয়ে হয়ে অন্য কারো দখলে না যায় সেজন্য এই অপরাধ করেছে কারণ সে সীতাকে খুব ভালবাসে। কেউই বেণুর জামিনের জন্য দাঁড়াল না যেহেতু সে জামিন অযোগ্য অপরাধ করেছে। তাকে জেলে পাঠানো হল পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত।

প্রায় একমাস হাসপাতালে সীতার চিকিৎসা চলে ক্ষত নিরাময়ের জন্য। যদিও অ্যাসিড আক্রান্ত চামড়া এবং তার নীচের মাংসের ক্ষত নিরাময় হল কিন্তু আক্রান্ত জায়গার চামড়া কুঁকড়ে কাল বিকট রূপ ধারণ করল। তার মুখের দিকে তাকালে বীভৎস দেখায়। একমাস পর সীতাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয় এবং সে সম্পূর্ণভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়। মা বাবা ছাড়া এই পৃথিবীর আর কাউকে সে মুখ দেখাতে চায় না। সে আয়নায় নিজের মুখ দেখে না, সে কেঁদে ফেলে। সে তার ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখে। বলার অপেক্ষা রাখে না আনন্দের সংগে সীতার বিয়ে ভেঙে গেছে তার সুখী বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন বুদবুদের মত ফেটে গেছে।

এদিকে বেণুর শুনানি সম্পূর্ণ হল এবং সে দশ বছরের জন্য কঠোর কারাবাসের সাজা পায় এবং তার এক লক্ষ টাকা জরিমানা হয়। তাকে রাজ্যের প্রধান জেলে রাখা হয়।

সমগ্র গ্রাম সীতার এই করুণ পরিণতিতে স্তম্ভিত হয় এবং তার দুর্ভাগ্যে লোকজন কেঁদে ওঠে। তার প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, সহকর্মী শিক্ষক এবং ছাত্ররা তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করেছিল। অনেকেই তাকে দেখতে এসেছিল কিন্তু সে তাদের সামনে আসতে চায় নি।

এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর তিনমাস পেরিয়ে গেছে। একদিন সীতার বাবা তার ঘরে গিয়ে বলেনঃ বেটি, আর কতদিন তুই এই ঘরে থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন

কাটাবি? এই চারপাশের জগতে সবাই তোকে ভালবাসে এবং সকলে তোর প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা সবাই তোর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করে। তোর প্রিন্সিপ্যাল, প্রিয় ছাত্ররা তোকে দেখতে এসেছে। লক্ষ্মী মেয়ে একবারটি বসার ঘরে আয়। তারা সেখানে অপেক্ষা করছেন। তুই পোড়া অংশটা শাড়ি দিয়ে ঢেকে নিতে পারিস।"

সীতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে ভয়ংকর ক্ষতটা আড়াল করে হাসি মুখে দর্শনার্থীদের সামনে আসে। প্রিন্সিপ্যাল এবং ছাত্ররা তাকে অভিনন্দন জানায় সুপ্রভাত। সেও তাদের অভিনন্দিত করে এবং একটা চেয়ারে বসে। প্রিন্সিপ্যাল ডঃ মুকুন্দন তখন বলেন, ''সীতা আমরা সকলেই তোমার এই করুণ অবস্থায় ভীষণ দুঃখ পেয়েছি। আমরা তখনই খুশী হব যখন তোমাকে খুশী দেখব। তুমি আমাদের কলেজে অপরিহার্য, ছাত্ররা তোমায় এত ভালবাসে যে তারা তোমাকে ছাড়া অন্য বিকল্প শিক্ষক চায় না। অনুগ্রহ করে তাদের অনুরোধ স্বীকার কর। তুমি জান তোমার সহকর্মীরা কত স্নেহশীল। তারা সবাই তোমার কাজে ফেরার অপেক্ষায় আছে। জনসাধারণের দৃষ্টি এড়াতে আমরা তোমার যাতায়াতের জন্য একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করব।"

''প্রিন্সিপ্যাল স্যার যা বললেন তা মেনে নিলে ত লক্ষ্মী মেয়ে? তোমার কোথাও কোন সমস্যা হবে না। তার ওপর তোমার পছন্দের পেশা তোমার হারানো সুখ ফিরিয়ে দেবে", রবীন্দ্রন বলেন।

''একদম ঠিক", সীতার মা লক্ষ্মী বলেন। ''আর কতদিন বিষণ্ণ হয়ে একলা ঘরে বসে থাকবে? এই রকম করলে তুমি নিজেও মরবে এবং আমাদেরও মারবে। তোমার প্রিয় ছাত্রদের জন্য কাজে যুক্ত থাকলে ঈশ্বর তোমাকে শান্তি দিয়ে পুরস্কৃত করবেন।

''তোমরা সবাই যদি এইভাবে আমাকে জোড়াজুড়ি করো আমি পড়ানো চালিয়ে যাব। সব চেয়ে বড় কথা হল আমার কি আর ভবিষ্যত আছে? আমার জন্য আমি বাবা মায়ের চোখের জল ফেলতে চাই না। সুতরাং আমি ঠিক করেছি যে অন্যের জন্য কাজ করে বাঁচব তা সে যে কাজই হোক্ না কেন," সীতা অশ্রুপূর্ণ জলের ধারা নিয়ে উত্তর দেয়।

সবাই তার এই সঙ্কল্পে খুশী হন। প্রিন্সিপ্যাল তখন বলেন, ''প্রিয় সীতা, আমরা তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। তুমি আগামী কাল থেকেই তোমার পড়ানোর কাজ শুরু করে দিতে পার। আমরা তোমার জন্য সকালে ট্যাক্সি পাঠাবো।"

পরদিন সকালে সীতা তৈরী হয় তার শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেওয়ার জন্য। একটা শাড়ি পরে এবং মুখের পোড়া অংশটা ঢাকে শাড়ির আঁচল দিয়ে। ট্যাক্সি তাকে কলেজে নিয়ে গেল এবং সেখানে কলেজ প্রাঙ্গণে সহকর্মী, ছাত্রছাত্রীরা তাকে উষ্ণ

অভ্যর্থনা দিল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ মুকুন্দন তাকে ফুলের তোড়া দেন এবং সহকর্মীদের কক্ষে নিয়ে যান। ছাত্র এবং সহকর্মীদের ভালবাসায় সীতার দুঃখ এবং একাকীত্ব ঘুচে গেল। সে আগের মত সুখী হল। ছাত্রদের মাঝে সে তার জীবনের সুখ এবং শান্তি ফিরে পেল।

বলার অপেক্ষা রাখে না শহরে এবং চমকপ্রদ ভাবে জীবনের মুল স্রোতে ফিরে আসায় প্রচার মাধ্যমের প্রতিবেদনে সীতা খুব জনপ্রিয় হয়। সাধারণত অ্যাসিড হামলার বলিরা সমাজে অবহেলিত হয় এবং তারা এন জি ও দ্বারা স্থাপিত পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় পায়। সকালে এবং বিকালে সে দুর্বল ছাত্রদের জন্য বিশেষ ক্লাস নিত এবং তা হত নিয়মিত ক্লাসের আগে এবং পরে। সে নিজেই অনুরোধ করে তার জন্য আর ট্যাক্সি না পাঠাতে এবং সে বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে বাসেই যাতায়াত শুরু করে। ৮-৩০ এ সে কলেজে পৌঁছাত এবং ৫-৩০ এ কলেজ থেকে বের হত। এইভাবে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে সে দুর্বলতর ছাত্রদের তিনঘণ্টা পড়াত এ ছাড়া সে কলেজে জাতীয় সেবা প্রকল্পের (NSS) দায়িত্ব নেয় এবং এই বিভাগে চমৎকার দৃষ্টান্তমূলক সামাজিক কাজ করে।

রাজ্য সরকার সীতার সরকারী অনুদানহীন কলেজকে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত কলেজে উন্নীত করে ভাল ফল এবং সামাজিক কাজকর্মকে প্রাধান্য দিয়ে। এইভাবে সীতা এবং আর সব শিক্ষক সরকারের উচ্চ বেতন পেতে শুরু করে। সীতা এবং তার বাবা মায়ের কাছে এই ঘটানাটা বড়ই স্বস্তিদায়ক হয়। যদিও তার বিবাহিত জীবন অসম্ভব হয় কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থনৈতিক দুর্ভাবনা আর রইল না।

সীতার কলেজের এন এস এস (NSS) বিভাগ রাজ্যে সেরা ইউনিটের পুরস্কার পায়। সীতার পরিষেবা এবং কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রাজ্য সরকারের নজরে আসে এবং সে রাজ্যের আদর্শ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত হয় এবং তার নাম জাতীয় পুরস্কারের জন্য অনুমোদন করে। নিঃসন্দেহে দেশ তাকে সেই বছরের জন্য আদর্শ শিক্ষকের সম্মান দেয়। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে জাতীয় পুরস্কার পেয়ে সে বলে, ''আমি এই পুরস্কার এবং সম্মান পৃথিবীর হাজারো অ্যাসিডে আক্রান্ত হতভাগ্যদের জন্য উৎসর্গ করলাম। আমি জীবনে ফিরে আসতে পেরেছি এবং এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি শুধুমাত্র আমার চারপাশের লোকজনদের ভালবাসা এবং সহানুভূতির কারণে। অতএব আমি দেশের সব মানুষকে অনুরোধ করব সেই সব মানুষদের প্রতি ভালবাসা দেখাতে যারা নারকীয় দুঃখে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় তাদের বাড়িতে বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে। অকারণে বিনাদোষে তারা বলি হয় আমানবিক নৃশংসতার। যথাযথ ভালবাসা এবং সহানুভূতি পেলে এই সব বিড়ম্বিত মানুষেরা আমার মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে।'' সব দর্শকেরা তার এই অনুরোধকে প্রচুর করতালি দিয়ে স্বাগত জানায়।